

দিন যায় দ্বীন বেচে



আকিদা সিরিজ
দিন
যায়
দ্বীন
বেচে

লেখকঃ
আলি হুসান উসামা হাফিঃ

প্রচ্ছদঃ
মুহাম্মাদ যুফার

দিন যায় দ্বীন বেচে

আকিন্দা সিরিজ
**দিন
যায়
দ্বীন
বেচে**

লেখকঃ
আলি হুসান উসামা হাফিঃ

দিন যায় দীন বেচে

সাধারণ পাঠকদের কথা চিন্তা করে এই পিডিএফ ফাইলটি তৈরি করা হয়েছে, যেন তারা ভবিষ্যতে এই পিডিএফ দ্বারা উপকৃত হতে পারে। এটি কোন বই না। জনপ্রিয় লেখক শাইখ আলি হাসান উসামা হাফিঃ তিনি ফেসবুকে আকিদা সিরিজ "দিন যায় দীন বেচে" এই শিরোনামে পোস্ট করেন ১১ মে থেকে ১৯ মে (২০২০) পর্যন্ত। সেখানের পোস্ট গুলোই বই আকারে পিডিএফে সাজানো হয়েছে।

- মুহাম্মাদ যুফার

দিন যায় দ্বীন বেচে

সূচিপত্র

দিন যায় দ্বীন বেচে-০১

তাওহিদের দর্পনে শায়খ আব্দুর রাজ্জাক বিন ইউসুফ

•আল্লাহর দেহ বা আকৃতি সম্পর্কে

পৃষ্ঠাঃ ৯-১৫

দিন যায় দ্বীন বেচে-০২

তাওহিদের দর্পনে শায়খ মুজাফফর বিন মুহসিন

•আল্লাহর দেহ বা আকৃতি সম্পর্কে

পৃষ্ঠাঃ ১৫-২১

দিন যায় দ্বীন বেচে-০৩

তাওহিদের দর্পনে শায়খ আব্দুল হামিদ ফাইযি মাদানি-১

• আল্লাহ্ সাকার

•আল্লাহর ধরণ আছে

•আল্লাহ তাআলা থেকে ক্রটির গুণ ও নাচক করা যাবে না

পৃষ্ঠাঃ ২১-২৯

দিন যায় দ্বীন বেচে-০৪

শায়খ আব্দুল হামিদ ফাইযি মাদানি-২

দিন যায় দ্বীন বেচে

- আল্লাহ্‌র দিক আছে
 - ইবনু আবিল ইজ সম্পর্কে
- পৃষ্ঠাঃ ৩০-৩৬

দিন যায় দ্বীন বেচে-০৫

- শায়খ আব্দুল হামিদ ফাইযি মাদানি-৩
- আল্লাহ্‌র জন্য স্থান সাব্যস্ত করা
- পৃষ্ঠাঃ ৩৬-৪২

দিন যায় দ্বীন বেচে-০৬

- তাওহিদের দর্পনে শায়খ আবু বকর জাকারিয়া -০১
- শায়খ সালিহ ইবনে ফাওজান, ড.মঞ্জুরে ইলাহী এবং শায়খ আবু বকর জাকারিয়া সাহেবদের দ্বারা হকপন্থীদের অপর মিথ্যাচার
 - আহলুস সুন্নত ওয়াল জামায়াতের দল কয়টি
- পৃষ্ঠাঃ ৪২-৪৮

দিন যায় দ্বীন বেচে-০৭

- শায়খ আবু বকর জাকারিয়া -০২
- আল্লাহ্‌র সিফাত
 - তাওয়িল

দিন যায় দ্বীন বেচে

পৃষ্ঠা:৪৮-৫৬

দিন যায় দ্বীন বেচে-০৮

শায়খ আবু বকর জাকারিয়া -০৩

•ইমাম আহমিদ ইবনে হাম্বল রহঃ ও কি আহলুস সুন্নাহর
বহির্ভূত কালাম?

•ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল রহঃ এর তাওয়িল
পৃষ্ঠা:৫৬-৬৭

দিন যায় দ্বীন বেচে-০৯

শায়খ আবু বকর জাকারিয়া -০৪

•ইমাম বুখারি,তিরমিজি,ইবনু বাতা, যাজজাজ হাম্বলী, ইবনু
শায়বা,দামেরী এবং ইবনুল তাইমিয়াহ রহঃ প্রমুখ ব্যক্তিদের
তাওয়িল

পৃষ্ঠা:৬৭-৭৭

দিন যায় দ্বীন বেচে-১০

শায়খ আবু বকর জাকারিয়া -০৫

•আল্লাহর সিফাত

•তাফউইদ

পৃষ্ঠা:৭৭-৯০

দিন যায় দ্বীন বেচে

দিন যায় দ্বীন বেচে-১১

শায়খ আবু বকর জাকারিয়া -০৬

•ইমাম তাহাবি রহঃ অপর খোলা মিথ্যাচার

পৃষ্ঠাঃ৯০-৯৯

দিন যায় দ্বীন বেচে-১২

শায়খ আবু বকর জাকারিয়া -০৭

•আল্লাহ্ তায়ালায় সীমা পরিধি

পৃষ্ঠাঃ৯৯-১০৪

দিন যায় দ্বীন বেচে-১৩

শায়খ আবু বকর জাকারিয়া -০৮

•আল্লাহ্ তায়ালায় সীমা পরিধি

পৃষ্ঠাঃ১০৫-১১৩

দিন যায় দ্বীন বেচে

দিন যায় দ্বীন বেচে-১৪

শায়খ আবু বকর জাকারিয়া -০৯

- ৬৮ জন সালাফ ইমামদের নাম উল্লেখ করে তাদের আকিদা বর্ণনা

পৃষ্ঠাঃ১১৩-১১৯

দিন যায় দ্বীন বেচে-১৫

শায়খ আবু বকর জাকারিয়া -১০

- আল্লাহর আকার-পরিধি-পরিসীমা সম্পর্কে
- শাফাআতের হাদিসটি সম্পর্কে

পৃষ্ঠাঃ১১৯-১২৮

দিন যায় দ্বীন বেচে-১৬

শায়খ আবু বকর জাকারিয়া-১১

- হাশমিয়্যাহ আকিদা
- কাররামিয়া আকিদা
- আহলুস সুন্নাহর সংখ্যাগরিষ্ঠ ইমাম আল্লাহ তাআলার অন্যস্থান, সীমা ও পরিধি অস্বীকার করেন।

পৃষ্ঠাঃ১২৮-১৪০

শায়খ আবদুর রাজ্জাক বিন ইউসুফ

তাওহিদের দর্পণে শায়খ আবদুর রাজ্জাক বিন ইউসুফ

যারা স্পষ্ট গোমরাহ, তাদের নামোল্লেখ করে জাতিকে সতর্ক করা সালাফগণের আদর্শ। শায়খ আবদুর রাজ্জাক বিন ইউসুফকে যেসব কারণে আমরা গোমরাহ বলি, তা বিস্তৃত আলোচনার দাবি রাখে। আমাদের এই দাবির পক্ষে তার বই ও আলোচনা থেকে শত শত দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করা যাবে। আজ আমরা তার রচিত একটা বই থেকে তার ভ্রান্তিগুলো তুলে ধরব।

বইয়ের নাম : কে বড় লাভবান

পৃষ্ঠাসংখ্যা : ১৯৩

দ্বিতীয় সংস্করণ : ২০১১ খ্রিষ্টাব্দ

মুদ্রিত মূল্য : ৫০৮

আমাকে বইটির সন্ধান দিয়েছেন শ্রদ্ধেয় মাওলানা আবদুল মাবুদ ভাই। আল্লাহ তাকে উত্তম প্রতিদান দান করুন।

শায়খের শিরকি আকিদা

শায়খ দেহবাদী আকিদা লালন করেন। ইতিপূর্বে তার একটি ভিডিও আলোচনাও আমরা পাবলিশ করেছি, যা থেকে বিষয়টি স্পষ্ট। আজ যেহেতু আমরা একটি নির্দিষ্ট বইয়ের রিভিউ করছি, তাই এ বই থেকেই

দিন যায় দ্বীন বেচে

তার ভ্রান্তি তুলে ধরব। দেহবাদীরা যে আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআত থেকে বহিস্কৃত, বিদআতি এবং অনুসরণের অযোগ্য—এ ব্যাপারে গোটা উম্মাহ একমত। দেহবাদীরা হলো এই উম্মাহর মূর্তিপূজারী; তারা আল্লাহর জন্য মূর্তি কল্পনা করে সেই মূর্তির উপাসনা করে। তিনি তার বইয়ে (পৃ. ১০) লেখেন :

তিনটি বিষয়ের ওপর ইমান আনলে আল্লাহর প্রতি ইমান আনা হয় :

- (১) তাঁর দেহ ও শরীরগত অস্তিত্বের ওপর,
- (২) তাঁর গুণাবলির ওপর,
- (৩) তাঁর অধিকারের ওপর।

এখানে তিনি স্পষ্টভাবেই লিখলেন, আল্লাহর প্রতি ইমান আনার অর্থ হচ্ছে, তাঁর দেহ ও শরীরগত অস্তিত্বের ওপর বিশ্বাস স্থাপন করা। হ্যাঁ, এখন হয়তো তার অনুসারীরা দাবি করবে, তিনি তো আর বলেননি যে, আল্লাহর দেহ ও শরীর মাখলুকের দেহ ও শরীরের মতো। আমরা বলব, এ দাবি কয়জন দেহবাদী করেছে? দেহবাদীরাও তো বলে, আল্লাহর দেহ রয়েছে, তবে তা আমাদের দেহের মতো নয়। শায়খও এখানে স্পষ্ট দাবি করলেন, আল্লাহর দেহ ও শরীর রয়েছে এবং তা মেনে নেওয়ার নামই হচ্ছে ইমান। এক্ষেত্রে তিনি আদি ও আসল দেহবাদীদের মতো ভদ্রতাটুকুও প্রদর্শন করে বলার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেননি যে, 'তবে তা আমাদের দেহ ও শরীরের মতো নয়'।

এই বিদআতি দাবির পক্ষে তিনি যেসব দলিল উল্লেখ করেছেন, তা নিম্নরূপ :

১. 'আল্লাহ তাআলা আদমকে তাঁর আকৃতিতেই সৃষ্টি করেছেন। এ হাদিস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহর মুখমণ্ডল রয়েছে।'

এখানে কয়েকটি বিষয় :

দিন যায় দ্বীন বেচে

(ক) ‘তার’ শব্দটা কার দিকে ফিরেছে—আদম আ.-এর দিকে নাকি আল্লাহর দিকে, এ নিয়ে ইখতিলাফ রয়েছে। অনেকের মত হলো, শব্দটা আদম আ.-এর দিকে ফিরেছে।

(খ) যদি ধরেও নেওয়া হয় যে, আল্লাহর দিকে ফিরেছে, তাহলে এর হাকিকত কী, তা আল্লাহ ছাড়া আর কে জানেন? এর যে ব্যাখ্যাগুলো সালাফ ইমামগণ করেছেন, তার মধ্যে তো এই বিদআতি আকিদা নেই। তাছাড়া এ ব্যাপারে তো কেউই দ্বিমত করেনি যে, আল্লাহর কোনো কিছুই বান্দাদের মতো নয়।

(গ) আকৃতি সাব্যস্ত হলে এর দ্বারা মুখমণ্ডল সাব্যস্ত হবে কীভাবে? এর জন্য স্বতন্ত্র দলিল দিলেও এক কথা ছিল; কিন্তু তিনি একটির দ্বারা ফলাফল সাব্যস্ত করার নীতি অনুসারে আরেকটি বিষয়ও কিয়াস করে ফেলেছেন। আকিদার ক্ষেত্রে কি এ ধরনের কিয়াস চলে? এক্ষেত্রে একটি বিষয়ের দ্বারা আরেকটি বিষয় সাব্যস্ত করা কি অনুমোদিত বলে বিবেচিত হয়? তাহলে তিনি যে আল্লাহর জন্য দেহ ও শরীর সাব্যস্ত করলেন, এর কারণে তো আল্লাহ তাআলার অনিত্যত্ব ও নশ্বরতা সাব্যস্ত হচ্ছে, অর্থাৎ এটা মেনে নিলে মুসলিমের বিশ্বাসে আল্লাহ আর রবই থাকছেন না—এ কথা তাকে কে বোঝাবে?

২. ‘তোমরা যে দিকে তোমাদের মুখমণ্ডল ফেরাবে, সেদিকেই আল্লাহর মুখ রয়েছে। অত্র আয়াত ও হাদিস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহর মুখমণ্ডল রয়েছে।’

এখানে কয়েকটি বিষয় :

(ক) তিনি বারবার মুখ শব্দের সঙ্গে মণ্ডল শব্দ যোগ করছেন। মণ্ডল অর্থ, গোলাকার বস্তু। যেমন : ভূমণ্ডল। তিনি জেনেবুঝে আল্লাহর শানে এই শব্দ প্রয়োগ করছেন কি না, তা স্পষ্ট নয়।

দিন যায় দ্বীন বেচে

(খ) আল্লাহ তাআলার ‘ওয়াজহুন’ (শাব্দিক অর্থ : চেহারা) কি কোনো অঙ্গ? আহলুস সুন্নাহর কোনো ইমামই এ কথা বলেননি। সকলে এটাকে একটা ‘সিফাত’ তথা গুণ বলেছেন। তাহলে এর দ্বারা আল্লাহর দেহ ও শরীর কীভাবে সাব্যস্ত হচ্ছে?

(গ) এই আয়াতের বাহ্যিক অর্থ দ্বারা যদি এটা প্রমাণ করা হয় যে, যেখানেই বান্দারা ফিরবে, সেখানেই আল্লাহর ‘মুখমণ্ডল’ (?) রয়েছে, তাহলে যেসব ভ্রান্ত লোক এ আয়াতের আলোকে বলে, আল্লাহ সর্বত্র বিরাজমান, তাদেরকে কোন যুক্তিতে তিনি তাকফির করেন? যে অপরাধ তিনি নিজেই করেন, তার দ্বারা অন্যকে অভিযুক্ত করা কতটুকু যৌক্তিক?

৩. ‘আল্লাহ তোমাদেরকে স্বীয় নফসের ভীতি প্রদর্শন করেন। অত্র আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহর নফস আছে।’

উপরিউক্ত আয়াতে নফস শব্দটি ‘সত্তা’ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থাৎ আল্লাহ তোমাদেরকে নিজের ব্যাপারে সতর্ক করছেন। খোদ আসারিরাই এই ব্যাখ্যা করেছে। যেমন, ‘সবকিছু ধ্বংসশীল শুধু তার চেহারা ছাড়া’—এই আয়াত দ্বারা কেউ এ কথা বলে না যে, শুধু আল্লাহর চেহারা ধ্বংস হবে না; বাকি গোটা দেহ (?) ধ্বংস হবে। নাউজুবিল্লাহ। বরং সকলে বলে, সেখানে পুরো সত্তা বোঝানোর জন্যই ওই শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। একই কথা এখানেও প্রযোজ্য। আল্লাহ ভীতি প্রদর্শন করছেন কি শুধু তাঁর নফসের ব্যাপারে? অন্য কিছুর ব্যাপারে নয়? আচ্ছা, আল্লাহর নফস কেমন? সেটাকে তিনি কিসের ভিত্তিতে দেহের অংশ সাব্যস্ত করলেন? কোনো যুগের কোনো ইমামই তো সেটাকে দেহের অংশ বলেননি। সালাফের অনুসরণ ছাড়া কেমন সালাফি তিনি? বরং নামে সালাফি হলেও কাজে তো দেখা যাচ্ছে, পুরোদস্তুর বিদআতি।

৪. ‘আল্লাহ তাআলা হাসেন। হাসার মতো অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ তাঁর রয়েছে, যা

দিন যায় দ্বীন বেচে

হাসার উপযোগী।’

আল্লাহর শানে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ শব্দ দেহবাদীরা ছাড়া আর কেউই প্রয়োগ করে না। বিশেষত প্রত্যঙ্গ শব্দটা তো অনেক ভয়ানক। প্রত্যঙ্গ অর্থ হলো, অঙ্গের অঙ্গ তথা উপাঙ্গ। উদাহরণস্বরূপ, পা হলো অঙ্গ। পায়ের আঙুল হলো প্রত্যঙ্গ। দেহ ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সৃষ্টি। একসময় এগুলো ছিল না। তাহলে তখন আল্লাহ কীভাবে ছিলেন? এগুলো সৃষ্টির পর তাঁর অবস্থায় কি পরিবর্তন ঘটেছে? নাকি এই বিদআতি শায়খ আল্লাহর সত্তা ও গুণাবলির মতো এগুলোকেও নিত্য, অবিনশ্বর ও অনাদি বলবেন? এগুলোকে অনাদি বললে এগুলো সৃষ্টির মূল উপাদানকেও অনাদি বলতে হবে। এগুলো তো স্পষ্ট শিরক। আল্লাহ ছাড়া আর কোনো কিছুকে কেউ নিত্য, অবিনশ্বর ও অনাদি বললে সে মুশরিক। সে মুখে যত তাওহিদের বুলি আওড়াক না কেন, উম্মাহর সর্বসম্মতিক্রমে সে মুশরিক। তার পেছনে সালাতও আদায় হবে না।

এরপর তিনি আল্লাহ তাআলার জন্য যথাক্রমে হাত, আঙুল, অঙ্গুলি, ডান ও বাম মুষ্টি, পা, পায়ের গোছা ইত্যাদি সাব্যস্ত করেন। আর তার ধারণা অনুসারে, এ সবই অঙ্গ। তাই তিনি আল্লাহ তাআলার দেহ, শরীর ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের দাবির পক্ষে এগুলোকে দলিল হিসেবে উপস্থাপন করেন।

৫.এ হাদিস দ্বারা প্রমাণিত হয়, আল্লাহ তাআলা স্থানান্তর হন। স্থানান্তর হওয়া দেহের বৈশিষ্ট্য। তিনি যখন আল্লাহর জন্য দেহই সাব্যস্ত করে বসেছেন, তখন এর সকল গুণাগুণও তো নির্দিধায়ই সাব্যস্ত করবেন। তারই পরিপ্রেক্ষিতে তিনি আল্লাহ তাআলার জন্য স্থানান্তর সাব্যস্ত করেছেন। এর দ্বারা বোঝা গেল :

(ক) আল্লাহ তাআলার স্থান রয়েছে।

(খ) তিনি স্থানের মধ্যে রয়েছেন। অর্থাৎ তার সীমা রয়েছে।

দিন যায় দ্বীন বেচে

(গ) তিনি কোনো দিকে রয়েছেন।

(ঘ) তিনি এক স্থান থেকে অন্য স্থানে গমন করেন। যেমন, এখানে তিনি রাতের শেষাংশে ‘নুজুল’ (শাব্দিক অর্থ : অবতরণ করা) দ্বারা প্রমাণ করতে চেয়েছেন, আল্লাহ স্থানান্তরিত হন। অর্থাৎ যে সময়ে তিনি নিকটবর্তী আকাশে ‘নুজুল’ করেন, সে সময় সপ্তাকাশের ওপর থেকে তাতে স্থানান্তরিত হন। এখন স্বযোষিত সহিহ শায়খকে কেউ যদি জিজ্ঞেস করে, প্রতিমুহূর্তেই তো পৃথিবীর কোথাও না কোথার রাতের শেষাংশ চলতে থাকে, তাহলে আল্লাহ কখন সপ্তাকাশের ওপরে থাকেন আর কখন নিকটবর্তী আকাশে আসেন? এখানে কোন দেশের সময় বিবেচ্য? তাহলে জানি না, শায়খ সেই প্রশ্নের কী জবাব দেবেন। নাকি নিজে যেমন বিদআতি, প্রশ্নকারীকেও একই রকম বিদআতি ট্যাগ লাগিয়ে দেবেন।

তার সঙ্গে দ্বিমত করাটাও অবশ্য ভয়ের বিষয়। কারণ, তিনি নিজের শিরকি আকিদা তার অবলা ও অন্ধ মুকাল্লিদদেরকে বোঝানোর জন্য ভূমিকায়ই রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর ওপর মিথ্যাচার করেছেন। তিনি লেখেন :

রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর যথাযথ অনুসরণ ছাড়া বেশি বেশি সালাত, সিয়াম, ও তাসবিহ-তাহলিলকারীকে রাসুল ﷺ হত্যা করার আদেশ দিয়েছেন এবং এমন ইবাদতগুজার ব্যক্তিদেরকে যারা হত্যা করবে তারা সবচেয়ে বেশি নেকির অধিকারী হবে বলে সিদ্ধান্ত পেশ করেছেন। -বুখারি : ২/১০২৪ এ জন্য এ বইটিতে সহিহ হাদিসের মাধ্যমে রাসুল ﷺ-এর যথাযথ অনুসরণ করে অধিক আমল করার নমুনা যথাসাধ্য পেশ করা হয়েছে।

এই শায়খ কার কাছে বুখারি পড়েছেন, আল্লাহ ভালো জানেন। তিনি তার মুকাল্লিদ ছেলেপেলেদেরকে নিয়ে কিয়ামত পর্যন্ত সময়ে শুধু বুখারি থেকেই নয়, যেকোনো হাদিসের কিতাব থেকে এমন একটা হাদিস কি দেখাতে পারবেন, যা তার উদ্ভট ও অবাস্তব দাবিকে সমর্থন করে? হাদিসের এমন বিকৃত অনুবাদ আল্লাহর জমিনে কেউ করেছে কি না,

দিন যায় দ্বীন বেচে

আল্লাহই ভালো জানেন। এই মানুষটা কীভাবে হত্যা ও জঙ্গিবাদের উসকানি দিচ্ছে তা ভাবলেও গা শিউরে ওঠে। তার উসকানিতে প্রভাবিত হয়ে কেউ যদি তার শিরকি আকিদাবিরোধী দেশের প্রায় সকল আলিমকে টার্গেট করে হত্যা করতেও নেমে পড়ে, তা-ও অবাস্তব হবে না। আর তার বইটিতে কিসের সহিহ হাদিসের আলোকে ফিকহ উপস্থাপন করা হয়েছে? তিনি যে আল্লাহর জন্য দেহ, শরীর, অঙ্গ ও প্রত্যঙ্গ সাব্যস্ত করলেন—তার এই শিরকি আকিদার পক্ষে কিয়ামত পর্যন্ত সময়ে পারলে একটা সহিহ হাদিস তিনি উপস্থাপন করে দেখান।

শায়খ মুজাফফর বিন মুহসিন

তাওহিদের দর্পণে

শায়খ মুজাফফর বিন মুহসিন

শায়খ আবদুর রাজ্জাক বিন ইউসুফের মতো শায়খ মুজাফফর বিন মুহসিনও দেহবাদী আকিদার প্রচারক। ব্যক্তিগত জীবনে তারা দেহবাদ দ্বারা প্রভাবিত হলে তা নিয়ে আমরা মাথা ঘামাতাম না। কিন্তু পুরো একটা জাতিকে যখন তারা জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে এই উম্মাহর মূর্তিপূজারীতে পরিণত করার মিশন নিয়ে মাঠে নামেন, তখন ইলমের একজন আমানতদার হিসেবে এ ব্যাপারে আমাদের মুখ খুলতেই হয়, জাতিকেও সতর্ক করতে হয়। ফিকহের শাখাগত বিষয় নিয়ে ক্যাচাল আমি কখনো করিনি। অপ্রয়োজনীয় বিতর্কেও যথাসম্ভব জড়াইনি। কিন্তু এটা তো এমন একটা বিষয়, যা উম্মাহকে আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআত থেকে বের করে গোমরাহির চৌহদ্দিতে পৌঁছে দেয়। তাই এ ব্যাপারে নীরবতা অবলম্বন কিয়ামতের দিন আমাদের বিপক্ষে আল্লাহর নিকট হুজ্জত (প্রমাণ) হবে। সুতরাং কে কী বলল, সে দিকে না তাকিয়ে সুস্পষ্ট গোমরাহির ব্যাপারে জাতিকে সতর্ক করাই আমাদের ওপর ফরজ দায়িত্ব।

দিন যায় দ্বীন বেচে

শায়খের বিদআতি আকিদা

শায়খ মুজাফফর বিন মুহসিন দেহবাদী বা আরও কোমল করে বললে, দেহবাদ দ্বারা প্রভাবিত আকিদা-বিশ্বাস লালন করেন। তিনি তার বই ‘ভ্রান্ত আকীদা বনাম সঠিক আকীদা’ বইয়ে সহিহ আকিদার লেভেল লাগিয়ে গলদ আকিদা প্রচার করেছেন। আজকের আলোচনাটি যথাযথভাবে বুঝতে পাঠককে ধৈর্যের পরিচয় দিতে হবে। অক্ষরবাদী মস্তিষ্ক নিয়ে পর্যবেক্ষণ করলে অনেক ক্ষেত্রেই বিভ্রম ও বিভ্রান্তি ঘটা স্বাভাবিক। এখানে শায়খের ভ্রান্তিটি সূক্ষ্ম; কিন্তু তা মানুষকে হকের চৌহদ্দি থেকে অবচেতনে বহিস্কৃত করে দিতে যথেষ্ট। যাহোক, এখানে প্রথমে আমরা তার আলোচনা অবিকলভাবে উপস্থাপন করছি। তিনি লেখেন :

তাঁর (আল্লাহ তাআলার) আকার আছে। তিনি শোনে, দেখে এবং কথা বলেন। তাঁর হাত, পা, চেহারা, চোখ ইত্যাদি আছে। তবে তার সাথে সৃষ্টির কোনো কিছুই তুলনীয় নয়। ...অতএব আল্লাহর আকার আছে। তাই কুরআন ও সহিহ হাদিসে তাঁর আকৃতি সম্পর্কে যা বলা হয়েছে, তার কোনো রূপক বা বিকৃত অর্থ করা যাবে না। বরং বলতে হবে, তিনি তাঁর মতো।(পৃ. ৩১-৩২)

একই আলোচনা তিনি তার বই ‘ভ্রান্তির বেড়াজালে ইকামাতে দ্বীন’-এও (পৃ. ১২১-১২২) করেছেন।

হাদিসে একশ্রেণির ভ্রান্ত মানুষের পরিচয় সম্পর্কে বলা হয়েছে, তারা কুরআন পড়ে; তবে কুরআন তাদের কণ্ঠনাগি অতিক্রম করে না। শায়খও কুরআন পড়েছেন, হাদিস পড়েছেন; কিন্তু কুরআন ও হাদিসের সহিহ বুঝ তার হাসিল হয়নি। তাই তিনি এখন সহিহ আকিদার শিরোনামে বিদআতি আকিদা প্রচার করেছেন। আলোচ্য আকিদার ভ্রান্তি স্পষ্টভাবে বোঝার জন্য আমরা কয়েকটি বিষয়ের ওপর আলোকপাত

দিন যায় দ্বীন বেচে

করব :

১. আকিদার ক্ষেত্রে সর্বজনস্বীকৃত মূলনীতি হচ্ছে, কুরআন ও অকাট্যভাবে প্রমাণিত সহিহ হাদিসে আল্লাহ তাআলার ব্যাপারে যে সকল নাম, গুণ বা বৈশিষ্ট্য উল্লেখিত হয়নি, তা কখনোই আল্লাহ তাআলার ব্যাপারে প্রয়োগ করা যাবে না।

২. শায়খ আল্লাহ তাআলার ব্যাপারে ‘আকার’ ও ‘আকৃতি’ শব্দ দুটো প্রয়োগ করেছেন। তিনি হয়তো তার স্বভাবসুলভ অজ্ঞতার কারণে দুটোকে সমার্থক ভেবেছেন। কিন্তু বাস্তবতা এরূপ নয়। বিজ্ঞানের ভাষায় বিষয়টা বুঝুন : ধরা যাক, আপনার সামনে একটি বই রাখা আছে। এখন বইটির তিনটি মাত্রা(dimensions) আছে—দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও উচ্চতা বা বেধ। এবার দেখুন, বইটির আকৃতি কেমন? এর আকৃতি হলো, চতুর্ভুজাকৃতি; যেহেতু এর চারটি ধার আছে। আর বইটির আকার হলো ধার বা মাত্রাগুলোর পরিমাপ। যেমন : ৪সেমি×৫সেমি। যদি বেধকে হিসাবের মধ্যে ধরি, তাহলে সঠিক আকার হলো ৪সেমি×৫সেমি×২সেমি (3D), যা আয়তনকে নির্দেশ করে। আমরা সাধারণত আকার ৭×৬ এই ভাবেই প্রকাশ করি।

৩. উপরিউক্ত বিশ্লেষণটি মাথায় রেখে এবার ‘আকার’ ও ‘আকৃতি’ শব্দ দুটো নিয়ে ভাবুন। আল্লাহ তাআলার আকৃতি আছে—এর অর্থ হলো, আল্লাহ তাআলা ত্রিভুজাকৃতি বা চতুর্ভুজাকৃতি বা অন্য কোনো আকৃতির অধিকারী। আচ্ছা, আকৃতি থাকে কিসের? নিশ্চয়ই দেহবিশিষ্ট কোনো কিছুর। যার দৈহিক অস্তিত্ব আছে, তার আকৃতি আছে। যার দৈহিক অস্তিত্ব নেই, তার আকৃতিও নেই। আল্লাহ তাআলার আকার থাকার কী অর্থ? এর অর্থ হলো, আল্লাহ তাআলার ধার, প্রস্থ ও মাত্রা রয়েছে। সেই ধারের পরিমাপও রয়েছে। যেমন : ৪সেমি×৫সেমি বা ৪সেমি×৫সেমি×২সেমি (3D) প্রভৃতি; যা তাঁর আয়তন নির্দেশ করবে।

দিন যায় দ্বীন বেচে

৪. এবার আসি দলিল প্রসঙ্গে। কুরআন বা সহিহ হাদিস থেকে কিয়ামত পর্যন্ত সময়ে শায়খ কি আল্লাহ তাআলার জন্য আকার, আকৃতি, দেহ, ধার, প্রান্ত, দৈর্ঘ্য-প্রস্থ-উচ্চতা-বেধ, পরিমাপ, কাঠামো বা আয়তন প্রমাণ করতে পারবেন?

৫. আল্লাহ তাআলার আকার বা আকৃতি সাব্যস্ত হলে অপরিহার্যভাবে তার সীমা, দিক ও স্থানও সাব্যস্ত হবে। কারণ, এগুলো তার অপরিহার্য বৈশিষ্ট্য।

৬. শায়খ আকার ও আকৃতি সাব্যস্ত করার জন্য সবচে বড় যে ভ্রান্তির পরিচয় দিয়েছেন তা হলো, তিনি কুরআন ও হাদিসে বর্ণিত আল্লাহ তাআলার বিভিন্ন গুণকে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ভেবেছেন। এরপর সারাজীবন কালামশাস্ত্রের বিরোধিতা করেও এখানে এসে কালামি যুক্তি দিয়ে সেই অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলোর অপরিহার্য ফল হিসেবে আকার ও আকৃতি সাব্যস্ত করার অপচেষ্টা চালিয়েছেন। শায়খ আবদুর রাজ্জাক বিন ইউসুফ এক্ষেত্রে সরাসরি দেহ ও শরীর শব্দ ব্যবহার করেছেন, তবে শায়খ মুজাফফর সতর্কতা ভেবে তার স্থলে আকার ও আকৃতি শব্দ ব্যবহার করেছেন। তবে উভয়ের ব্যাখ্যা একই। যার কারণে উভয়েরই দেহবাদী হওয়া অনুমিত।

৭. আল্লাহর আকার প্রমাণ করার জন্য শায়খ আল্লাহ তাআলার অনেক গুণকে অঙ্গ ধরে এই গলদ ইজতিহাদ করেছেন। তবে এক্ষেত্রে সবচে হাস্যকর হলো তার এই কথাটি : ‘আল্লাহর আকার আছে... (কারণ,) তিনি শোনে।’ আল্লাহর শোনে—এর দ্বারা তার আকার কীভাবে প্রমাণিত হয়? নাকি তিনি শোনে এই কথার দ্বারা প্রথমে কান সাব্যস্ত করেছেন। এরপর সেই কানকে অঙ্গ ধরেছেন। এরপর সেই অঙ্গ দ্বারা দেহ সাব্যস্ত করেছেন। এরপর সেই দেহের জন্য আকারও নির্ধারণ করেছেন। এমন চেইন কিয়াস তাকে কে শেখাল?

দিন যায় দ্বীন বেচে

৮. তিনি আরবি ভাষা সম্পর্কেও চরম অজ্ঞতার পরিচয় দিয়েছেন বা ইচ্ছাকৃত বিকৃতি-অপব্যাক্ত্য করেছেন। ইমাম আবু হানিফা রহ.-এর একটি উক্তি উল্লেখ করে তিনি তার বিভ্রান্তিকর অনুবাদ করেন এবং ইচ্ছাকৃতভাবে ইমাম আবু হানিফার নামে মিথ্যাচার করেন। ইমাম আবু হানিফা রহ.-এর ভাষ্য ছিল :

فهو له صفات بلا كيف.

(কুরআন ও হাদিসে আল্লাহ তাআলার ব্যাপারে উল্লেখিত বিভিন্ন অঙ্গের নাম মূলত) আল্লাহ তাআলার ধরনহীন গুণ।

এ কথা দ্বারা স্পষ্ট, ইমাম আবু হানিফা রহ. আল্লাহ তাআলার জন্য ধরন সাব্যস্ত করেন না। তিনি অন্যত্রও স্পষ্ট বলেছেন :

الله تعالى موجود بلا كيف ولا مكان

আল্লাহ তাআলা কোনো ধরন ও কোনো স্থান ছাড়া বিদ্যমান রয়েছেন।

ইমাম মালিক রহ.-কে এক ব্যক্তি আল্লাহ তাআলার ইসতিওয়ার ধরন সম্পর্কে প্রশ্ন করলে তিনি তাকে তিরস্কার করে মজলিস থেকে বের করে দিয়েছিলেন। এককথায়, আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআতের স্বীকৃত আকিদা হচ্ছে, আল্লাহ তাআলা ধরনমুক্ত। কারণ, ধরন হলো সৃষ্টির বৈশিষ্ট্য। আর আল্লাহ তাআলার সৃষ্টির সকল বৈশিষ্ট্য থেকে পবিত্র। ইমাম তহাবি রহ. লেখেন :

ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر

যে ব্যক্তি আল্লাহ তাআলাকে কোনো মানবীয় গুণে গুণান্বিত করবে, নিশ্চয়ই সে কাফির হয়ে যাবে।

দিন যায় দ্বীন বেচে

কিন্তু শায়খ যেহেতু আল্লাহ তাআলার জন্য হাত, পা এবং অন্যান্য গুণের (তার দৃষ্টিতে অঙ্গের) ধরন সাব্যস্ত করেছেন, যেটাকে তিনি আকার ও আকৃতি শব্দে ব্যক্ত করেছেন, তাই তিনি ইমাম আবু হানিফা রহ.-এর উক্তির মারাত্মক গলদ অনুবাদ করেন। তিনি (بلا كيف) ‘ধরনহীন’ শব্দের অনুবাদে লেখেন :

‘কিন্তু সেগুলো কারও সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ নয়।’

এই শব্দের এমন উদ্ভট অনুবাদ তো আরবি ভাষা জানে এমন প্রাথমিক তালিবুল ইলমরাও করবে না। আমাদের প্রথম বর্ষের ছাত্ররাও এই অনুবাদের জালিয়াতি ধরে ফেলতে পারবে। আহ, মানুষ ফেরকাবাজি করতে গিয়ে এভাবেই বুঝি অন্ধত্ব বরণ করে নেয়! হায় আফসোস!

৯. সকল আকার ও আকৃতি সৃষ্ট। সুতরাং তা সবই অনিত্য ও নশ্বর। আল্লাহ তাআলা হলেন স্রষ্টা, নিত্য, অবিনশ্বর এবং অনাদি। আল্লাহ তাআলার জন্য আকার ও আকৃতি সাব্যস্ত করার অর্থ হলো, তাকে প্রভুত্বের অপরিহার্য গুণ থেকে বের করে আনা অথবা এই দুটো সৃষ্টিকেও স্রষ্টার মতো নিত্য ও অনাদি সাব্যস্ত করা। সর্বজনস্বীকৃতভাবে প্রথমটি হচ্ছে কুফর এবং দ্বিতীয়টি হচ্ছে শিরক।

১০. এখন কেউ এসে বলতে পারে, তিনি আল্লাহ তাআলার জন্য আকার ও আকৃতি সাব্যস্ত করলেও সঙ্গে তো এ কথা বলে দিয়েছেন যে, // তবে তার সাথে সৃষ্টির কোনো কিছুই তুলনীয় নয়।// এর দ্বারা তিনি সাদৃশ্য ও উপমা নাকচ করে দিয়েছেন। এর জবাবে আমরা বলব, হুবহু এই কাজটাই দেহবাদীরা করে এবং সাদৃশ্য নাকচের এই ভান করে মনে মনে তুষ্টির ঢেকুর তোলে। ইমাম নববি রহ. বলেন :

‘সে বলে, আল্লাহ তাআলার আকৃতি আছে, তবে তা অন্যান্য আকৃতিগুলোর মতো নয়। তার এই কথা স্পষ্ট গলদ। কারণ, আকৃতি থাকা প্রমাণ করে যে, তিনি গঠিত। আর প্রত্যেক গঠিত বস্তু অনিত্য

দিন যায় দ্বীন বেচে

(নশ্বর) হয়ে থাকে। অথচ আল্লাহ তাআলা অনিত্য নন। সুতরাং তিনি গঠিতও নন। অতএব তিনি আকৃতিবিশিষ্ট নন। এটা দেহবাদীদের সেই কথার মতোই যে, আল্লাহ তাআলার দেহ রয়েছে; তবে তা অন্যসব দেহের মতো নয়।

শায়খ আবদুল হামিদ মাদানি

তাওহীদের দর্পণে

শায়খ আবদুল হামিদ ফাইযি মাদানি-০১

এই লেখাটি পড়ার আগে অবশ্যই এই সিরিজের পূর্ববর্তী লেখা দুটো পড়ে নেবেন। তাহলে পুরো বিষয়টা বুঝতে সহজ হবে। এই পর্বে আমরা শায়খ আবদুল হামিদ মাদানির চারটি আকিদাগত ভ্রান্তি নিয়ে আলোচনা করব ইনশাআল্লাহ।

আল্লাহ সাকার

সিরিজের দ্বিতীয় পর্বে শায়খ মুজাফফর বিন মুহসিনের আলোচনা প্রসঙ্গে আমরা যে ভ্রান্তিটি তুলে ধরেছিলাম, একই ভ্রান্তিতে এই শায়খও নিপতিত হয়েছেন। তিনি সহিহ আকিদা শিরোনামে আল্লাহ তাআলার জন্য আকার সাব্যস্ত করে বসেছেন। যদিও এই ক্ষেত্রে যথাযথ শব্দ হতো ‘আকৃতি’; কিন্তু অজ্ঞতার দরুন তিনি ‘আকৃতি’ শব্দের স্থলে ‘আকার’ শব্দই ব্যবহার করেছেন। তবে তার দাবির পক্ষে কুরআন-হাদিস থেকে কোনো দলিল দিতে পারেননি; বরং তিনি তার এই ভ্রান্ত আকিদা প্রমাণ করার জন্য কালামশাস্ত্র ও কiyাসের দ্বারস্থ হয়েছেন। তবে এক্ষেত্রেও তিনি কালাম ও কiyাসের মূলনীতি রক্ষা করেননি; বরং তার অনুসৃত শায়খদের অন্ধ তাকলিদ করে মনগড়া যুক্তি আওড়ে

দিন যায় দ্বীন বেচে

বসেছেন। তিনি তার রচিত ‘মহান আল্লাহর নাম ও গুণাবলী’ বইয়ে (পৃ. ১৯২-১৯৩) লেখেন :

যদি আপনি বলেন, ‘আল্লাহর আকার নেই’, তার মানে তিনি দৃশ্য নন। তাঁকে দেখা যাবে না। তাহলে প্রশ্ন যে, আপনি বেহেশতে যাবেন কি না। ‘অবশ্যই’। সেই বেহেশতের সবচেয়ে বড় নিয়ামত কী? নিশ্চয়ই আপনি বলবেন, ‘আল্লাহর দিদার’। অর্থাৎ আপনি আল্লাহর দিদার লাভ করবেন। তাঁর চেহারা আছে। সেই চেহারা বেহেশতিগণ বেহেশতে দর্শন করবে। আর সেই দর্শন ও দিদার হবে জান্নাতের সবচাইতে বড় সুখ।... আর যে জিনিসকে দেখা যাবে, তাকে কি নিরাকার বলা যাবে? মোটের উপর কথা, মহান আল্লাহর আকার আছে। তবে সে আকার কেমন, তা কেউ বলতে পারে না।

আকার ও আকৃতি বিষয়ে আমরা পূর্বের পর্বে আলোচনা করে এসেছি। পাঠক অবশ্যই সেই পোস্টটি পড়ে তার সঙ্গে এই উদ্ধৃতির যৌক্তিকতা মিলিয়ে দেখবেন। এখানে অতিরিক্ত যে বিষয়গুলো বলা প্রয়োজন :

১. আল্লাহ ও তাঁর রাসুল কোথাও বলেননি যে, আল্লাহর আকার আছে। কিন্তু তিনি যে দৃশ্য, এ কথা আল্লাহ ও তাঁর রাসুলই আমাদের জানিয়েছেন। শায়খের দাবি অনুসারে দৃশ্য হওয়া এবং আকার থাকা পরস্পর অপরিহার্য বিষয়। অর্থাৎ, একটা সাব্যস্ত করলে অপরটাও সাব্যস্ত করতে হবে। কথা হলো, তার এই বিদআতি মূলনীতি কি আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের গোচরে ছিল না? তবে কেন শুধু দৃশ্যের কথা জানানো হলো; কোথাও আকারের কথা বলা হলো না!

২. মুমিনরা জান্নাতে আল্লাহর দিদার লাভ করবে—এর দ্বারা কীভাবে সাব্যস্ত হলো যে, আল্লাহর আকার আছে? প্রথম কথা হলো, এই যে একটার দ্বারা আরেকটা সাব্যস্ত করার অপপ্রয়াস চালাচ্ছেন, এটা কি কালাম ও কিয়াস নয়? তাহলে কোন মুখে আবার কালাম ও কিয়াসের

দিন যায় দ্বীন বেচে

বিরোধিতা করেন, যখন নিজেই তাতে লিপ্ত থাকেন? দ্বিতীয় কথা হলো, দুনিয়াতে আমরা কোনো কিছু দেখার জন্য তা সাকার হওয়া জরুরি। এটা দুনিয়ার রীতি। কারণ, এখানে আল্লাহ আমাদের চোখকে নিরাকার দেখার উপযুক্ত করে বানাননি। জাম্মাত তো এমন সৃষ্টি, যার কল্পনাও কোনো অন্তরে আসবে না। তাহলে দুনিয়ার ওপর জাম্মাতকে বা ইহকালের ওপর পরকালকে কীভাবে কiyাস করা যথাযথ হয়; যেখানে উভয়টির মধ্যে স্পষ্ট ফারাক বিদ্যমান? তৃতীয় কথা হলো, যা সাকার নয়, তা আল্লাহ দেখাতে সক্ষম নন; দেখাতে হলে অপরিহার্যভাবে সাকারই হতে হবে—এই দাবি তো আল্লাহ তাআলার অক্ষমতা প্রকাশ করেছে। এগুলো তো মুতাজিলাদের মতো উদ্ভট সিস্টেমের দলিল হয়ে যাচ্ছে। আমরা কুরআন-সুন্নাহ দ্বারা জেনেছি যে, মুমিনরা আল্লাহর দর্শন লাভ করবে—সহিহ আকিদার পরিচায়ক হলো, আমরা শুধু এতটুকুই বিশ্বাস করব। যুক্তি দ্বারা এর ওপর কোনো কিছু বৃদ্ধি করব না। অথচ এই কাজটাই তিনি করলেন। চতুর্থত, আল্লাহ দৃশ্য হওয়ার জন্য

আকার থাকা জরুরি হয়, তাহলে একই যুক্তিতে তো দেহ থাকাও জরুরি হবে। যদিও আকার দেহেরই অপরিহার্য বৈশিষ্ট্য। তাহলে কষ্ট করে দূরবর্তী আকারের কথা না বলে সাহস করে দেহের কথা বলে দিলেই তো ঝামেলা চুকে যায়। কিন্তু তাদের অক্ষরবাদী মস্তিষ্ক দেহবাদের সাদৃশ্য কল্পিতভাবে এড়াতে এখানে এসে কিছুটা জান বাঁচানোর তাগাদা অনুভব করে।

৩. কুরআন ও হাদিস দ্বারা আমরা জেনেছি, জাম্মাতে মুমিনরা আল্লাহকে দেখবে। কোথাও তো বলা হয়নি যে, আল্লাহর চেহারা দেখবে। কিন্তু লেখক এই দাবি করে বসলেন যে, মুমিনরা আল্লাহর চেহারা দেখবে। এখানে তিনি কয়েকটি ভ্রান্তির পরিচয় দিয়েছেন। প্রথমত, তিনি সাদৃশ্যবাদের পরিচয় দিয়েছেন। মানুষকে যেমন দেখতে হলে আমরা চেহারা দেখি, জাম্মাতেও মুমিনরা একইভাবে আল্লাহর চেহারা দেখবে।

দিন যায় দ্বীন বেচে

এর দ্বারা তিনি আল্লাহকে বান্দার ওপর কিয়াস (তুলনা) করেছেন। দ্বিতীয়ত, তিনি আল্লাহর ‘ওয়াজহুন’ (শাব্দিক অর্থ : চেহারা)-কে আল্লাহর অঙ্গ ভেবে বসেছেন। অথচ সর্বসম্মতভাবে তা আল্লাহর গুণ। যদি তিনি বিশ্বাসই করেন যে, এটা আল্লাহর গুণ; তাহলে কেন বলছেন যে, মানুষ আল্লাহর চেহারা দেখবে? তৃতীয়ত, তিনি পিঠ বাঁচানোর জন্য অন্যান্য দেহবাদীদের মতো উম্মাহর মধ্যে বিদআতি আকিদা ঢুকিয়ে দিয়ে শেষে এসে দায় সারতে চেয়েছেন এ কথা বলে যে, //মহান আল্লাহর আকার আছে। তবে সে আকার কেমন, তা কেউ বলতে পারে না। এ প্রসঙ্গে ইমাম নববি রহ.-এর উক্তি আমরা পূর্বের পর্বে উল্লেখ করেছি।

৪. দেহবাদি আকিদার সব ধ্বজাধারীর মধ্যে একটা কমন বৈশিষ্ট্য চোখে পড়ে, তারা নিজেদের ভ্রান্ত আকিদা প্রমাণ করার জন্য প্রচুর যুক্তি ও কালামের আশ্রয় নেয়। মূলত এ ধরনের কালামিদের নিন্দাই সালাফগণ করে গেছেন।

ইমাম আবু আবদিল্লাহ উন্দুলুসি রহ. (মৃত্যু : ৬৯৯ হিজরি) বাহজাতুন নুফুস গ্রন্থে বড় সুন্দর লিখেছেন :

وقد قال الإمام مالك رحمه الله: كل ما يقع في القلب فإله بخلاف ذلك، لأن كل ما يقع في القلب على ما تقدم إنما هو خلق من خلق الله، فكيف يشبه الخالق المخلوق

ইমাম মালিক রহ. বলেছেন, অন্তরে যা কিছু উদ্ভেক হয়, আল্লাহ তাআলা এরচে ব্যতিক্রম। কারণ, পূর্বে দেখা জিনিসের ওপর ভিত্তি করে অন্তরে যা কিছু উদ্ভেক হয়, তা আল্লাহরই সৃষ্টি। স্রষ্টা কীভাবে সৃষ্টির সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ হবেন?

আল্লাহর ধরন আছে

দিন যায় দ্বীন বেচে

তিনি তার বইয়ে (পৃ. ২২) লেখেন :

কেউ যদি বলে, ‘আল্লাহ কেমন?’ আপনি বলুন, ‘আল্লাহ কেমন, তা তো বলা যাবে না। কারণ, তিনি তাঁর কেমনত্বের কথা বলেননি; বরং বলেছেন, তাঁর মতো কোনো কিছুই নেই। আর মানুষের জ্ঞান তাঁর কেমনত্বের নাগাল পেতে পারে না।

এই শায়খরা ইসলামি আকিদার সবগুলো স্তম্ভই মনে হচ্ছে, একের পর এক ভেঙে ফেলবেন। ধরন, রকম ও কেমনত্ব—যে শব্দই বলি না কেন, এ সবই আল্লাহ তাআলার সৃষ্টি। স্রষ্টার সঙ্গে সৃষ্টিকে জুড়ে দেওয়ার কী আজীব অপপ্রয়াস! এর দ্বারা স্রষ্টাকে প্রভুত্বের গুণ থেকে বের করে দেওয়া হয় বা তাঁর কেমনত্বকে তাঁর মতোই নিত্য, অনাদি ও অবিনশ্বর দাবি করা হয়। অথচ প্রথমটি কুফর এবং দ্বিতীয়টি শিরক। আমিরুল মুমিনিন আলি রা. থেকে এ ব্যাপারে একটি উক্তি পাওয়া যায়; যদিও এর বর্ণনাসূত্র নিয়ে বিতর্ক রয়েছে। তবে তার দিকে নিসবত না করা হলেও বাস্তবতার দৃষ্টিকোণ থেকে উক্তিটি বড় যথার্থ ও বাস্তবসম্মত :

(قِيلَ لَهُ أَيْنَ اللَّهُ، فَقَالَ: إِنَّ الَّذِي أَيْنَ الْأَيْنَ لَا يُقَالُ لَهُ أَيْنَ، فَقِيلَ لَهُ: كَيْفَ اللَّهُ، فَقَالَ: إِنَّ الَّذِي كَيْفَ الْكَيْفَ لَا يُقَالُ لَهُ كَيْفَ).

জিজ্ঞেস করা হলো, আল্লাহ কোথায়? তিনি বললেন, যিনি ‘কোথায়’ (স্থান) সৃষ্টি করেছেন, তার ব্যাপারে প্রশ্ন করা যায় না যে, তিনি কোথায়। জিজ্ঞেস করা হলো, আল্লাহ কেমন? তিনি বললেন, যিনি ‘কেমন’ (ধরন) সৃষ্টি করেছেন, তার ব্যাপারে বলা প্রশ্ন করা যায় না যে, তিনি কেমন।

ইমাম আবু হানিফা রহ. থেকে স্পষ্টভাবে বর্ণিত রয়েছে :

اللَّهُ تَعَالَى مَوْجُودٌ بَلَا كَيْفَ وَلَا مَكَانَ

“আল্লাহ তাআলা কোনো ধরন ও কোনো স্থান ছাড়া বিদ্যমান রয়েছেন।”

দিন যায় দ্বীন বেচে

ধরন হলো অনিত্য বস্তুর গুণ। আল্লাহ তাআলা হলেন নিত্য, চিরন্তন ও অবিনশ্বর। ধরন মানে হলো রূপ, আকার, আকৃতি, অবস্থা, স্থান বা কালের বন্ধনযুক্ত হওয়া ইত্যাদি। কোনো মুমিন কি এ কথা বলতে পারে যে, আল্লাহ তাআলারও ধরন রয়েছে; তবে সেই ধরন আমাদের অজ্ঞাত? বান্দা যখন আল্লাহ তাআলার জন্য ধরন সাব্যস্ত করবে, তখন তো সে আল্লাহ তাআলার সত্তাগত বৈশিষ্ট্য অস্বীকার করে তাকে সৃষ্টির সমপর্যায়ে নিয়ে আসল। এরপর সে যতই সেই ধরনের স্বরূপ আল্লাহ তাআলার ইলমে ন্যস্ত করুক না কেন, তা অর্থহীন হয়ে যাবে। এটা অনেকটা গরু মেরে জুতো দান করার মতো বিষয়।

ইমাম মালিক রহ. থেকে এ ব্যাপারে মোট তিনটি বর্ণনা প্রমাণিত :

ক. بلا كيف

খ. وكيف عنه مرفوع

গ. والكيف غير معقول

ইমাম তিরমিজি রহ. ছাড়াও ইমাম হিবাতুল্লাহ লালকাঈ, ইমাম বায়হাকি, ইমাম ইবনু হাজার রহ. প্রমুখ বিদ্বান মনীষীগণ তাঁর থেকে এই বর্ণনাগুলো উল্লেখ করেছেন।

ইমাম মালিক রহ. বলেন,

(ক) ‘কোনো ধরন ব্যতিরেকে’। অর্থাৎ আল্লাহ তাআলার সত্তা থেকে ধরনকে সম্পূর্ণ নাকচ করতে হবে। তার জন্য কোনোপ্রকার ধরন সাব্যস্ত করা যাবে না। নিশ্চয়ই তাঁর জন্য গুণ সাব্যস্ত করতে হবে। তবে তাঁর গুণ আমাদের মতো ধরনযুক্ত নয়; বরং তা সম্পূর্ণভাবে ধরনমুক্ত।

ইমাম মালিক রহ. বলেন,

দিন যায় দ্বীন বেচে

(খ) ‘আল্লাহ তাআলার ক্ষেত্রে ধরন প্রযোজ্য নয়।’ কারণ, ধরন হলো সৃষ্টির বৈশিষ্ট্য; স্রষ্টার বৈশিষ্ট্য নয়। ধরন হলো অনিত্য বিষয়। আর আল্লাহ তাআলার ক্ষেত্রে কোনো অনিত্য বিষয় প্রযোজ্য হয় না। আল্লাহ যেমন নিত্য, তাঁর সকল গুণও নিত্য। তাঁর সত্তা বা গুণাবলির মধ্যে কোনো সংযোজন-বিয়োজন তথা পরিবর্তন সংঘটিত হয় না। তিনি কখনো স্থান-কাল-পাত্র বা পরিমাণ-ধরনের বন্ধনে আবদ্ধ হন না।

ইমাম মালিক রহ. বলেন,

(গ) ‘আল্লাহ তাআলার ব্যাপারে ধরন বোধগম্য নয়।’ অর্থাৎ তুমি প্রশ্নকারী যে আল্লাহ তাআলার ইসতিওয়ার ধরন সম্পর্কে প্রশ্ন করছ; তাঁর ইসতিওয়ার কোনো ধরন হতে পারে—এটাই তো বোধগম্য নয়। আমাদের বোধবুদ্ধি ও বিবেক আল্লাহ তাআলার ক্ষেত্রে যেকোনো ধরনকে নির্দিধায় প্রত্যাখ্যান করেন। সুতরাং তাঁর ইসতিওয়ার কোনো ধরনই হতে পারে না।

আল্লাহ তাআলা থেকে ত্রুটির গুণও নাকচ করা যাবে না!

শায়খ তার বইয়ে (পৃ. ২১) লেখেন :

মহান আল্লাহর সকল গুণ কুরআন ও সহিহ হাদিসের দলিলসাপেক্ষ। কারও জ্ঞান বা অনুমিতি দ্বারা তা প্রমাণ ও বর্ণনা করা যাবে না। সুতরাং যা আছে বলে প্রমাণিত, তা আমাদেরকে বিনা কৈফিয়তে বিশ্বাস করতে হবে। যা নেই বলে প্রমাণিত, তা নেই বলেই বিশ্বাস করতে হবে এবং যা আছে অথবা নেই কিছু বলে প্রমাণিত নয়, অর্থাৎ কুরআন-হাদিস যে গুণের ব্যাপারে চুপ আছে, আমাদেরকেও সেই বিষয়ে চুপ থাকতে হবে। তার ব্যাপারে আছে অথবা নেই বলা যাবে না।

দিন যায় দ্বীন বেচে

প্রথমাংশ নিয়ে কথা হলো, তিনি নিজেই তো এই মূলনীতি মানেননি। আল্লাহর জন্য রীতিমতো আকার সাব্যস্ত করে বসেছেন; অথচ তা কুরআন-হাদিসে নেই। তাহলে তাদের তাওহিদ কি তত্ত্বেই থেকে যায়; প্রয়োগে আর জীবনে আসে না!

শেষাংশ নিয়ে কথা হলো, তিনি এখানে দাবি করলেন, যেসব গুণের ব্যাপারে কুরআন-হাদিস চুপ আছে, সেসব গুণের ব্যাপারে আমাদেরও অবশ্যই চুপ থাকতে হবে। আল্লাহ তাআলার সত্তা থেকে তা নিরোধ ও নাকচ করা যাবে না। তাহলে কেউ যদি বলে, ‘আল্লাহ কি কাঁদেন? শৌচকর্ম করেন? লজ্জিত হন? দুঃখিত হন?’ তাহলে আপনাকে চুপ থাকতে হবে। এমনকি কেউ যদি এগুলোর চাইতে খারাপ কোনো গুণও আল্লাহর শানে আরোপ করার ব্যাপারে আপনাকে প্রশ্ন করে, তবে আপনাকে মুখ বন্ধ করে থাকতে হবে। কারণ, কুরআন-হাদিস এসব গুণ আল্লাহ তাআলা থেকে নাকচ করেনি। তার এই বিদআতি মূলনীতি মেনে নিলে আল্লাহ তাআলার শান আর অক্ষুণ্ণ থাকবে না।

অথচ আল্লাহ তাআলা কুরআনে বলেন :

‘لِّلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ مَثَلُ السَّوْءِ وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ’

যারা পরকালে বিশ্বাস করে না, তাদের জন্য নিকৃষ্ট উপমা/গুণ। আর আল্লাহর জন্য রয়েছে উৎকৃষ্টতম উপমা/গুণ। {সূরা নাহল : ৬০}

এই আয়াতের ব্যাখ্যায় হাফিজ ইবনু কাসির রহ. লেখেন : ‘নিকৃষ্ট উপমা বলতে ক্রটি-বিচ্যুতি ও অসম্পূর্ণতা উদ্দেশ্য। আর উৎকৃষ্টতম উপমা বলতে সর্বতোমুখী পরিপূর্ণতা সর্বদিক দিয়ে আল্লাহর জন্যই সাব্যস্ত - এ কথা বোঝানো উদ্দেশ্য।’

এ আয়াত দ্বারা প্রতিভাত হলো, আল্লাহ তাআলার জন্য কোনো মন্দ/নিকৃষ্ট/ক্রটিপূর্ণ গুণ সাব্যস্ত নয়। কুরআন-হাদিসে স্পেসিফিকভাবে

দিন যায় দ্বীন বেচে

তা নাকচ করা হোক বা না হোক, তা আল্লাহ তাআলা থেকে নিরোধ করা সকল মুমিনের জন্য এই আয়াতের ওপর ইমান রাখার দাবি। কুরআনে জায়গায় জায়গায় আল্লাহ তাআলা বলেছেন, ‘জালিমরা তার ব্যাপারে যা কিছু বলে তিনি তা থেকে অনেক উর্ধ্বে।’ এই ‘যা কিছু’ কথাটা ব্যাপক। যত ধরনের ত্রুটিপূর্ণ কথা/গুণ/উপমা আল্লাহর শানে আরোপিত হতে পারে, আল্লাহ তাআলা কুরআনের অসংখ্য আয়াতে তা থেকে নিজেকে পবিত্র ঘোষণা করেছেন। এ কারণেই আহলুস সুন্নাহর আকিদা হলো :

اللّٰهُ سبحانه وتعالى منزّه عن جميع صفات النقص

আল্লাহ তাআলা সকল ত্রুটির গুণাগুণ থেকে মুক্ত।

কিন্তু এই সহিহ আকিদার দাবিদার শায়খ সর্বজনস্বীকৃত এই মূলনীতি মানতে নারাজ। অথচ এ ব্যাপারে আকিদার গভীরে না গিয়ে অক্ষরবাদী মস্তিষ্ক নিয়েও ইসলাম ওয়েব বা ইসলাম কিউ এ’র মতো সাইটগুলো দেখে নিলেও তার এই বিভ্রম কেটে যেত। কুরআনের নির্দেশনা এবং সালাফে সালাহিনের আদর্শের বাইরে গিয়ে তিনি আকিদার ক্ষেত্রে একটি বিদআতি মূলনীতির উদ্ভব ঘটিয়ে বসেছেন। আল্লাহর আকার প্রমাণ করার জন্য যুক্তির ছড়ি ঘোড়ালেও এই প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে এসে তিনি তার বিবেককে অকার্যকর করে ফেলে রেখেছেন এবং সম্পূর্ণ বাস্তবতাবিরোধী একটি মূলনীতি উদগীরণ করে বসেছেন।

এখানে যে তিনটি ভ্রান্তি উল্লেখ করা হলো, এরচেও জঘন্য ভ্রান্ত আকিদা তার বইয়ে রয়েছে। পরবর্তী পর্বে ইনশাআল্লাহ সেগুলোর আলোচনা আসবে।

শায়খ আবদুল হামিদ মাদানি-২

আল্লাহর দিক আছে

শায়খ তার ‘মহান আল্লাহর নাম ও গুণাবলি’ বইয়ে (পৃ. ২১) লেখেন :

মহান আল্লাহর যে সকল গুণ... আছে বলে প্রমাণিত, তা আমাদেরকে বিনা কৈফিয়তে বিশ্বাস করতে হবে। যা নেই বলে প্রমাণিত, তা নেই বলেই বিশ্বাস করতে হবে।... যেমন : ‘তিনি অসীম, তিনি সীমা-পরিধির উর্ধ্বে। তিনি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ও সাজ-সরঞ্জাম নিরপেক্ষ। অন্যান্য সৃষ্ট বস্তুর ন্যায় ষষ্ঠ দিক তাঁকে বেষ্টন করতে পারে না।’ {আকিদা তহাবি} অথচ আমরা জানি যে, মহান আল্লাহ উর্ধ্বে আছেন।

শায়খ প্রথমে একটি মূলনীতি বর্ণনা করলেন। এরপর তা স্পষ্ট করণার্থে ‘আকিদা তহাবিয়াহ’ গ্রন্থের একটি উদ্ধৃতি উল্লেখ করে তা খণ্ডন করলেন। অথচ এটাই আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআতের স্বীকৃত আকিদা। এসকল দেহবাদী শায়খ এভাবেই সালাফি নামধরণ করে উম্মাহর সালাফে সালাহিনের বিরুদ্ধাচারণ করে। আমরা ‘আকিদা তহাবিয়াহ’র ওপর নিজেদের আকিদার ভিত্তি রাখি বলে এরাই আবার আমাদেরকে জাহমিয়া বলে আখ্যায়িত করে। আর নিজেরা কিছু বিচ্ছিন্ন মতামতের উদ্ধৃতি দিয়ে উম্মাহর স্বীকৃত আকিদা প্রত্যাখ্যান করে এবং সালাফে সালাহিনের ওপর থেকে মানুষের আস্থা নষ্ট করার জন্য তাদের সহিহকেও গলদ হিসেবে উপস্থাপন করে।

ইমাম তহাবি রহ.-এর কথা হলো, আল্লাহ তাআলাকে ষষ্ঠ দিক পরিব্যাপ্ত করতে পারে না। তিনি দিক হতে মুক্ত। পূর্ব, পশ্চিম, উত্তর, দক্ষিণ, নিম্ন ও উর্ধ্ব—এ সকল দিকই আল্লাহ তাআলার সৃষ্টি। আর সৃষ্টি কখনো ঐষ্টাকে বেষ্টন করতে পারে না। তাছাড়া কোনো দিকে থাকা হলো দেহের বৈশিষ্ট্য। অথচ আল্লাহ তো কোনো দেহবিশিষ্ট সত্তা নন; বরং দেহের ঐষ্ঠা তিনি। সুতরাং আল্লাহ তাআলার দিকে কোনো দিককে

দিন যায় দ্বীন বেচে

সম্পূর্ণ করা যাবে না।

সাল্লাফে সালাহিনের এই স্বীকৃত আকিদার সঙ্গে দ্বিমত করে শায়খ আল্লাহ তাআলার জন্য একটি দিক সাব্যস্ত করলেন। আবার শুরুতে এ কথা বলে নিলেন, ‘আমরা জানি’। এই আমরা মানে কারা? হয়তো দেহবাদী ও সাদৃশ্যবাদীরা; লাগামহীন অক্ষরবাদ যাদেরকে বিভ্রান্তির চোরাবালিতে গাঁড়ে দিয়েছে।

ইমাম কুরতুবি রহ. বড় সুন্দর বলেছেন, ‘আল্লাহ তাআলা স্থান সৃষ্টি করেছেন। আর তিনি স্থানের মুখাপেক্ষী নন। স্থান ও কাল সৃষ্টির পূর্বে অনাদিকাল থেকেই তিনি আছেন। সে সময় তার স্থানও ছিল না, কালও ছিল না। তিনি তখন যেভাবে ছিলেন, এখনো সেভাবেই আছেন।’

এখানে আরেকটি বিষয় লক্ষণীয়, উপর বা উর্ধ্ব দিক বলতে আসলে কী বোঝায়? আমরা জানি, পৃথিবী কমলালেবুর মতো বৃত্তাকৃতি। আমরা পৃথিবীর চতুর্দিকে এর পৃষ্ঠের ওপর বসবাস করি। প্রত্যেকে নিজের মাথার ওপর আকাশ দেখতে পায়। পৃথিবীকে ঘিরে যে শূন্যস্থান, তাকেই আকাশ বলা হয়। সুতরাং এক্ষেত্রে উপর শব্দটা তো আপেক্ষিক। পৃথিবীর এক প্রান্তের অধিবাসীরা উপর বলতে যে দিক বোঝাচ্ছে, অন্য প্রান্তের লোকেরা তা বোঝাচ্ছে না। কখনো এটা সম্পূর্ণ বিপরীতধর্মীও হতে পারে। এখন কেউ যদি আল্লাহর জন্য উপর দিক সাব্যস্ত করে, তবে পৃথিবীর বিভিন্ন অবস্থান সাপেক্ষে তাঁর অবস্থাও পরিবর্তিত হবে। অথচ এটা অসম্ভব। ইমাম কুরতুবি রহ. লেখেন, ‘পূর্ববর্তী প্রায় সকল আলিম ও পরবর্তী নেতৃস্থানীয় আলিমদের নিকট গ্রহণযোগ্য মত হলো, আল্লাহর ব্যাপারে দিক শব্দ প্রয়োগ না করা। তাদের দৃষ্টিতে আল্লাহ উপর দিকে নন। কারণ, তিনি কোনো নির্দিষ্ট দিকে থাকার অর্থ হচ্ছে, তিনি কোনো স্থানে বা সীমায় আছেন। আর কোনো স্থানে বা সীমায় থাকার দ্বারা নড়াচড়া, স্থির থাকা, পরিবর্তন ঘটানো এবং অনিত্য (নশ্বর) হওয়া অপরিহার্য হয়ে যায়।’

দিন যায় দ্বীন বেচে

পূর্ববর্তীদের বিচ্ছিন্ন মতামত কখনো পরবর্তীদের জন্য দলিল হয় না। বিশেষত আকিদার ক্ষেত্রে উম্মাহর সংখ্যাগরিষ্ঠ সালাফের আকিদা অনুসরণ করাই আমাদের জন্য সাফল্য ও মুক্তির উপায়। পূর্ববর্তী কারও বিচ্ছিন্ন মতামত অনুসরণ করলে নিজেকে সালাফি নয়; বরং বিচ্ছিন্নতাবাদী নামে অভিহিত করাই অধিক বাস্তবানুগ হবে। ভুলকে ভুল বলাই ইনসাফের দাবি। কোনো ভুল অতীতে বিগত হলেই তা সঠিক হয়ে যাবে না। এমন হলে তো আহলুস সুন্নাহ বহির্ভূত সকল বাতিল ফেরকাকেও হক বলতে হবে। পূর্ববর্তীদের বিচ্ছিন্ন মতামত অনুসরণ করার ব্যাপারে উসুলুল ইফতা তথা ফাতওয়া প্রদানের মূলনীতি বিষয়ক গ্রন্থাদিতে অনেক সালাফের উক্তির আলোকে অত্যন্ত কঠোরভাবে নিষেধ করা হয়েছে।

এখানে একটি বিষয় স্পষ্ট হওয়া প্রয়োজন। কুরআনে আল্লাহর জন্য ‘উলু’ সাব্যস্ত করা হয়েছে। এই শব্দের অনেক অর্থ রয়েছে। যেমন : উচ্চতা, উর্ধ্বতা, উচ্চ মর্যাদা, মহত্ত্ব, প্রাধান্য, অহঙ্কার, বড়াই, উপর ইত্যাদি। আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআত আল্লাহ তাআলার জন্য নিঃসঙ্কোচে ‘উলু’ সাব্যস্ত করে। কিন্তু সেই উলুর মনগড়া ব্যাখ্যা তারা করে না। এই যে ‘উলু’কে আকল দ্বারা ‘দিক’ সাব্যস্ত করে বসল, এটাই ঘৃণ্য ও জঘন্য কালাম। এদের প্রত্যেক পদে পদে আপনি নিষিদ্ধ কালামের চর্চা দেখবেন। কিন্তু এরাই আবার বাহ্যিকভাবে কালামের নিন্দা বর্ণনা করে বেড়াবে জনসমক্ষে। যেহেতু কুরআনের একাধিক আয়াত দ্বারা প্রমাণিত যে, আল্লাহ তাঁর সৃষ্টি থেকে আলাদা, সুতরাং এ কথা নিশ্চিতভাবে বিশ্বাস করতে হবে যে, ‘উলু’ দ্বারা উপর দিক উদ্দেশ্য নয়। আল্লাহ তাআলার গুণাবলির তাওহিদের ক্ষেত্রে প্রথম ধাপই হলো ‘তানযিহ’; অর্থাৎ আল্লাহকে সৃষ্টির সঙ্গে সর্বপ্রকার সাদৃশ্য ও সংমিশ্রণ ইত্যাদি থেকে পবিত্র ঘোষণা করা।

এবার দেখুন, আল্লাহ হচ্ছেন স্রষ্টা; দিক হচ্ছে সৃষ্টি। আল্লাহ হচ্ছেন

দিন যায় দ্বীন বেচে

অনাদি; কিন্তু দিকের আদি ও সূচনা আছে। আল্লাহ হচ্ছেন নিত্য; দিক হচ্ছে অনিত্য। সুতরাং আল্লাহকে কোনো দিকে আবদ্ধ করা তাঁর সঙ্গে চরম গোস্তাখি ছাড়া কী! এর দ্বারা আল্লাহ তাআলার প্রভুত্বের অপরিহার্য গুণ অস্বীকার করা হয়; যা কুফর। অথবা দিককেও আল্লাহ তাআলার মতো অসৃষ্ট, অনাদি, নিত্য ও অবিনশ্বর সাব্যস্ত করা হয়; যা শিরক।

তাহলে এখন প্রশ্ন আসতে পারে, ‘উলু’ দ্বারা উদ্দেশ্য কী? এর জবাব হলো, প্রথমে তো ‘তানযিহ’ করতে হবে। অর্থাৎ এর দ্বারা যে দিক উদ্দেশ্য নয়, তা নির্দিধায় স্বীকার করে নিতে হবে। এরপর দুই পন্থা গ্রহণ করা যায় :

(ক) তাফউইদ। অর্থাৎ এর স্বরূপ, ধরন, প্রকৃতি, হাকিকত আল্লাহ তাআলার ইলমে ন্যস্ত করা। এর উদ্দেশ্য কী, তা নিজের পক্ষ থেকে নির্ধারণ না করে আল্লাহ তাআলাই সম্যক অবগত বলে মেনে নেওয়া।

(খ) যেহেতু উর্ধ্বতা ও সমুন্নতি দুভাবে হয়, এক হলো দিকের বিবেচনায়, আরেক হলো মর্যাদার বিবেচনায়। প্রথমটি যেহেতু নিশ্চিতভাবে নাকচ হয়ে গেছে, তাই নিঃসঙ্কোচে দ্বিতীয়টি সাব্যস্ত করে নেওয়া। আর বলা বাহুল্য, কুরআনের অসংখ্য আয়াত ও রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর অগণিত হাদিস দ্বারা আল্লাহ তাআলার মর্যাদাগত সমুন্নতি প্রমাণিত। সুতরাং এই আকিদা কুরআন-সুন্নাহ সমর্থিত। কুরআনের অনেক আয়াতে এরূপ বলা হয়েছে, ‘জালিমরা যা কিছু বলে আল্লাহ তা থেকে অনেক ‘উলু’তে’। এই ‘উলু’র অর্থ কী হবে? নিশ্চয়ই মর্যাদাগত সমুন্নতি। শব্দটিকে একই অর্থে ইমাম তহাবিও ব্যবহার করেছেন। বলা বাহুল্য, এই দুই পন্থার মধ্যে মৌলিক কোনো বিরোধ নেই।

ইমাম তহাবি রহ.-এর প্রথম বাক্য—‘তিনি (আল্লাহ) সীমা-পরিধির উর্ধ্বে’ বলার দ্বারাও এ দিকে ইঙ্গিত করেছেন। এখানে একে তো মর্যাদাগত সমুন্নতি বোঝানোর জন্য তিনি ‘উলু’ মূলধাতু থেকে উদ্ভূত

দিন যায় দ্বীন বেচে

শব্দ ব্যবহার করেছেন। এছাড়াও তিনি সীমা-পরিধিকে স্পষ্টভাবে নাকচ করেছেন। এ বিষয়টি বোঝানোর জন্য তিনি আরবি শব্দ ব্যবহার করেছেন ‘হুদুদ’। শব্দটি একে তো বহুবচন, তথাপি এর শুরুতে ‘আলিফ-লাম লিল ইসতিগরাক’ ব্যবহার করে শব্দটিকে আরও ব্যাপক করেছেন। এখন এর অর্থ দাঁড়ায়, আল্লাহ তাআলা সর্বপ্রকার ‘হুদুদ’ থেকে মুক্ত; চাই তা ‘স্থানিক’ হুদুদ হোক বা সময়গত হুদুদ হোক। স্থানিক হুদুদ নাকচ করার দ্বারাও দিক নাকচ হয়ে যায়; যা তিনি পরবর্তী বাক্যে স্পষ্টভাবেই ব্যক্ত করেছেন। কারণ, যেই বস্তু কোনো স্থানে থাকে, কেবল তারই দিক থাকে। যা কোনো স্থানে থাকে না, তার দিকও নির্ধারণ করা যায় না।

আকিদা তহাবির ব্যাখ্যাগ্রন্থ রচয়িতাদের মধ্যে যেসব সালাফ আল্লাহ তাআলা সীমা, পরিধি ও সর্বদিক হতে মুক্ত—এ ব্যাপারে সুদীর্ঘ আলোচনা করেছেন, তাদের কয়েকজন মনীষীর নাম ও সংশ্লিষ্ট গ্রন্থের কথা প্রসঙ্গত উদাহরণস্বরূপ উল্লেখ করা যায়। ইমাম ইসমাইল ইবনু ইবরাহিম শাইবানি রহ. (মৃত্যু : ৬২৯ হিজরি), ইমাম নাজমুদ্দীন তুরকি রহ. (মৃত্যু : ৬৫২ হিজরি), ইমাম হিবাতুল্লাহ তুর্কিস্তানি রহ. (মৃত্যু : ৭৩৩ হিজরি), ইমাম মাহমুদ ইবনু আহমাদ কুনাবি দিমাশকি রহ. (মৃত্যু : ৭৭১ হিজরি), ইমাম সিরাজুদ্দীন উমর গজনবি রহ. (মৃত্যু : ৭৭৩ হিজরি), ইমাম আকমালুদ্দীন বাবারতি রহ. (মৃত্যু : ৭৮৬ হিজরি), ইমাম ইবনু বিনত হিময়ারি রহ. (মৃত্যু : ৮৮১ হিজরি), আল্লামা মাহমুদ ইবনু আবি ইসহাক কুস্তানতিনি রহ. (মৃত্যু : ৯১৬ হিজরি), আল্লামা আবদুর রহিম ইবনু আলি আমাসি রুমি রহ. (মৃত্যু : ৯৪৪ হিজরি), আল্লামা কাফি হাসান আফেন্দি রহ. (মৃত্যু : ১০২৫ হিজরি), আল্লামা আবদুল গনি গুনাইমি মাইদানি রহ. (মৃত্যু : ১২৯৮ হিজরি) প্রমুখ।

এতজনের নাম উল্লেখ করতে হলো কেন? কারণ, দেহবাদীরা তাদের এই ভ্রান্ত আকিদার পক্ষে ইমাম ইবনু আবিল ইজ রহ.-এর একটি

দিন যায় দ্বীন বেচে

বিচ্ছিন্ন মত দ্বারা দলিল দেয়। যেহেতু তিনিও আকিদা তহাবির একটি ব্যাখ্যাগ্রন্থ রচনা করেছেন, তাই তার সেই গলদ ব্যাখ্যাকে ইমাম তহাবির কাঁধে চাপিয়ে দেওয়ার অপপ্রয়াস চালায়। অথচ ইবনু আবিল ইজ রহ.-এর এসব বিচ্যুতির ওপর তার যুগের বিদ্বৎ মনীষীগণই চরম আপত্তি করেছিলেন। হাফিজ ইবনু হাজার আসকালানি রহ. ‘ইনবাউল গুমর বি-আবনায়িল উমর’ গ্রন্থে (২/৯৫-৯৭) তাদের নামসহ পুরো বিষয়টি উল্লেখ করেছেন। যাদের মধ্যে সবিশেষ উল্লেখযোগ্য—ইমাম সা‘দুদ্দীন নববি, জামালুদ্দীন কুরদি, শারফুদ্দীন গাজ্জি, যায়নুদ্দীন ইবনু রজব, তাকিয়ুদ্দীন ইবনু মুফলিহ এবং শিহাবুদ্দীন হাজ্জি প্রমুখ।

ইমাম মোল্লা আলি কারি রহ. আল-ফিকহুল আকবারের ব্যাখ্যাগ্রন্থে (পৃ. ১৭১) এ প্রসঙ্গে লেখেন :

‘আল্লাহ তাআলা তাঁর সৃষ্টির উর্ধ্বে থাকার যে বিষয়টি কুরআনের নিম্নবর্ণিত আয়াত দ্বারা প্রমাণিত—‘তিনি তাঁর বান্দাদের “উপর” (আরবি শব্দ : ফাওকা) পরাক্রমশালী।’ {সূরা আনআম : ১৮} এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, স্তর ও মর্যাদাগত উচ্চতা; স্থানিক উচ্চতা নয়। আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআতসহ ইসলামের অন্য সকল দল—যেমন : মুতাজিলা, খারেজি ও অন্যান্য বিদআতিদের নিকটও এটাই স্বীকৃত। শুধু একদল দেহবাদী ও হাম্বলিদের মূর্খ লোকদের বিষয় ভিন্ন; যারা দিকের কথা বলে। তাদের এ কথা থেকে আল্লাহ অনেক উর্ধ্বে।’

এরপর তিনি ইবনু আবিল ইজ রহ.-এর ভুল প্রসঙ্গে আলোচনা করেন (পৃ. ১৭২) :

‘মোদ্দাকথা হলো, ব্যাখ্যাকার (ইবনু আবিল ইজ) সাদৃশ্য নাকচ করে স্থানিক উচ্চতার কথা বলে। এক্ষেত্রে সে একদল বিদআতির অনুসরণ করেছে। ...আশ্চর্যের বিষয় হলো, সে তার বাতিল মায়হাবের পক্ষে দলিল দিয়েছে যে, দুয়ার ক্ষেত্রে হাত আকাশের দিকে উত্তোলিত করা

দিন যায় দীন বেচে

হয়!'

ইমাম মুরতাজা জাবিদি রহ. তো আরও স্পষ্টভাবে বলেছেন, ইবনু আবিল ইজ রহ. ইমাম আবু হানিফা রহ.-এর আকিদার বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছেন। তিনি উলটো আহলুস সুন্নাহকে রদ করে বসেছেন। এক্ষেত্রে তিনি বিরুদ্ধবাদীদের ভাষায় কথা বলেছেন। এমনকি এ বিষয়ে তিনি সকল সীমা অতিক্রম করে ফেলেছেন। সুতরাং এ ব্যাপারে সতর্ক থাকা জরুরি। {ইতহাফুস সাদাতিল মুত্তাকিন বি শারহি ইহইয়ায়ি উলুমিদ দীন : ২/১৪৬}

শায়খ আবদুল হামিদ মাদানি-৩

আল্লাহর জন্য স্থান সাব্যস্ত করা

শায়খ তার 'মহান আল্লাহর নাম ও গুণাবলী' বইয়ের একাধিক জায়গায় আল্লাহ তাআলার জন্য স্থান সাব্যস্ত করেছেন। যেমন, তিনি লেখেন (পৃ. ৩২) :

তিনি সকল সৃষ্টির উর্ধ্বে আছেন। গ্রহ-নক্ষত্র পার হয়ে প্রথম আসমান এবং তার পরে আরো ছয় আসমানের উপরে আছে তাঁর কুরসি। কুরসি তাঁর পা রাখার "জায়গা"। তার উপরে আছে মহা আরশ। আরশের উপরে তিনি আছেন। আর তাঁর উপরে কিছু নেই। "এত উঁচু ও দূরে থেকেও" তিনি আমাদের নিকটে। তাঁর জ্ঞান ও দৃষ্টি আমাদের সাথে। অন্যত্র বলেন (পৃ. ২১২) :

আরশ হলো রাজার সিংহাসন। শরিয়তে আরশ বলা হয় সেই মহাসনকে, যার উপর মহান আল্লাহ সমারূঢ় আছেন।

শায়খ এখানে কয়েকটি বিষয় উল্লেখ করলেন :

দিন যায় দ্বীন বেচে

(ক) সৃষ্টির সবকিছুর ওপরে আছে আরশ। আর সেই আরশের ওপরে আল্লাহ আছেন।

(খ) আরশ হলো একটি মহা আসন, যার ওপর মহান আল্লাহ উপবিষ্ট।

(গ) আল্লাহ অনেক উঁচুতে ও দূরে আছেন।

(ঘ) তিনি আমাদের নিকটে এই অর্থে যে, তাঁর জ্ঞান ও দৃষ্টি আমাদের সাথে।

(ঙ) ছয় আসমানের ওপরে কুরসি রয়েছে আর সেই কুরসি তাঁর পা রাখার জায়গা।

আল্লাহ আছেন আরশের ওপরে। এই ওপরে থাকার কী অর্থ? ‘স্থানিকভাবে ওপরে’ বলার সুযোগ নেই। কারণ, আল্লাহ তাআলা সর্বপ্রকার স্থান হতে মুক্ত। চলমান সিরিজের পূর্বের পর্বে আমরা এ বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা করেছি। তাহলে প্রথমে নিশ্চিতভাবে স্থানিক উচ্চতা নাকচ করতে হবে। কারণ, এটাই ‘তানযিহ’ তথা আল্লাহকে সৃষ্টির সাদৃশ্য ও সংমিশ্রণ ইত্যাদি থেকে মুক্ত ঘোষণা করার দাবি; যা কুরআনের একাধিক আয়াত দ্বারা অকাট্যভাবে প্রমাণিত ফরজ বিধান। তাহলে এর অর্থ কী?

একদল বলবে, আমরা জানি না; এর প্রকৃত অর্থ আমরা আল্লাহর ইলমেই ন্যস্ত করছি। প্রথমে ‘তানযিহ’ করে যারা এ কথা বলবে, নিঃসন্দেহে তারা হকপন্থী। আর কেউ বলবে, এর দ্বারা মর্যাদাগত উচ্চতা বোঝানো উদ্দেশ্য। কারণ, আল্লাহ তাআলা সুউচ্চ, সমুন্নত। আরশ সৃষ্টির পূর্ব থেকেই তিনি সুউচ্চ ও সমুন্নত। যেহেতু সৃষ্ট সকল বস্তুর মধ্যে আরশ সর্বোচ্চ এবং সর্বোত্তম, তাই আল্লাহ আরশের কথা উল্লেখ করে তাঁর ওপর নিজের সমুন্নত হওয়ার কথা জানিয়েছেন। অর্থাৎ, তিনি শুধু আরশের ওপরই সমুন্নত নন; বরং গোটা সৃষ্টির ওপর

দিন যায় দীন বেচে

সমুন্নত—এ বাস্তবতাই পরিষ্কার করা উদ্দেশ্য, নিশ্চয়ই তারাও হকপন্থী। বলা বাহুল্য, সমুন্নত আল্লাহ তাআলার গুণ। কারণ, তাঁর নামই হচ্ছে ‘আলি, আ’লা এবং মুতা’আলি।

ইমাম আহমদ ইবনু হাম্বল রহ. এ বিষয়টি সুন্দরভাবে ব্যক্ত করেছেন :

وَكَانَ يَقُولُ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ مَسْتَوٍ عَلَى الْعَرْشِ الْمَجِيدِ... وَحَكِي
جَمَاعَةٌ عَنْهُ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ إِنَّ الِاسْتَوَاءَ مِنْ صِفَاتِ الذَّاتِ وَكَانَ يَقُولُ
فِي مَعْنَى الِاسْتَوَاءِ هُوَ الْعُلُوُّ وَالْإِرْتِفَاعُ وَلَمْ يَزَلِ اللَّهُ تَعَالَى عَالِيًا
رَفِيعًا قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَ عَرْشَهُ فَهُوَ فَوْقَ كُلِّ شَيْءٍ وَالْعَالِي عَلَى كُلِّ شَيْءٍ
وَإِنَّمَا خَصَّ اللَّهُ الْعَرْشَ لِمَعْنَى فِيهِ مُخَالَفَ لِسَائِرِ الْأَشْيَاءِ وَالْعَرْشُ
أَفْضَلُ الْأَشْيَاءِ وَأَرْفَعُهَا فَامْتَدَحَ اللَّهُ نَفْسَهُ بِأَنَّهُ عَلَى الْعَرْشِ بِ
اسْتَوَى أَيْ عَلَيْهِ عِلَا وَلَا يَجُوزُ أَنْ يُقَالَ اسْتَوَى بِمَاسَاةٍ وَلَا بِمَلَاقَاةٍ
تَعَالَى اللَّهُ عَنِ ذَلِكَ عُلَا كَبِيرًا وَاللَّهُ تَعَالَى لَمْ يَلْحَقْهُ تَغْيِيرٌ وَلَا تَبَدُّلٌ وَلَا
تَلَحُّقُهُ الْحُدُودُ قَبْلَ خَلْقِ الْعَرْشِ وَلَا بَعْدَ خَلْقِ الْعَرْشِ

নিশ্চয়ই মহান আল্লাহ মহিমান্বিত আরশের ওপর সমুন্নত।...
ইসতিওয়ার অর্থপ্রসঙ্গে তিনি বলতেন, সমুন্নত হওয়া এবং সুউচ্চ
হওয়া। আল্লাহ তাআলা তাঁর আরশ সৃষ্টির পূর্ব থেকেই সুউচ্চ ও সমুন্নত।
তিনি সবকিছুর উর্ধ্বে, সবকিছুর ওপরে। আল্লাহ তাআলা আরশকে
বিশেষিত করেছেন; কারণ, অন্য সব জিনিসের বিপরীতে তার মধ্যে
বিশেষ কিছু রয়েছে। আরশ সর্বোত্তম এবং সর্বোচ্চ জিনিস। এ কারণে
আল্লাহ তাআলা নিজের গুণ বর্ণনা করেছেন এ কথা বলে যে, তিনি
আরশের ওপর ইসতিওয়া করেছেন, অর্থাৎ তার ওপর সমুন্নত হয়েছেন।
এ কথা বলা বৈধ হবে না যে, তিনি স্পর্শ করার দ্বারা বা সমুখস্থ হওয়ার
দ্বারা সমুন্নত হয়েছেন। আল্লাহ তাআলা এ সবকিছু থেকে অনেক
উর্ধ্বে। আল্লাহ তাআলার সঙ্গে কোনো পরিবর্তন ও রূপান্তর সম্পৃক্ত হয়
না। আরশ সৃষ্টির পূর্বে এবং আরশ সৃষ্টির পরে কোনো প্রকার সীমা-
পরিধি তার সঙ্গে যুক্ত হয়নি। {আল-আকিদা, খাল্লাল : ১০৭-১০৮}

দিন যায় দ্বীন বেচে

এর দ্বারা স্পষ্ট হয়ে গেল যে, আল্লাহ তাআলা আরশের ওপরে থাকার অর্থ এ নয় যে, তিনি কোনো জায়গায় রয়েছেন। বরং এর দ্বারা আল্লাহর উচ্চতা, মহিমা ও অমুখাপেক্ষিতা বোঝানো উদ্দেশ্য। কারণ, আরশ সৃষ্টির পরে আল্লাহ তাআলার গুণের মধ্যে কোনো পরিবর্তন ও রূপান্তর হয়নি। কোনো সীমা-পরিধি-আয়তনও তাঁর সঙ্গে যুক্ত হয়নি। আর হবেই বা কীভাবে! তিনি তো দেহবিশিষ্ট নন।

কিন্তু শায়খ মাদানি আল্লাহ তাআলার জন্য রীতিমতো জায়গা সাব্যস্ত করে ফেলেছেন। তিনি ধরে নিয়েছেন, আল্লাহ সপ্তম আকাশের ওপরে অবস্থিত আরশের ওপরে উপবিষ্ট। তাইতো তিনি লিখেছেন, ‘আরশ হলো রাজার সিংহাসন। শরিয়তে আরশ বলা হয় সেই মহাসনকে, যার উপর মহান আল্লাহ সমারূঢ় আছেন।’ আর স্থানিক উচ্চতার কথা মাথায় নিয়েই তিনি দাবি করেছেন, ‘আল্লাহ আমাদের থেকে অনেক দূরে ও উঁচুতে।’

ইমাম আবু হানিফা রহ. লেখেন :

لو كان في مكان محتاجاً للجلوس والقرار فقبل خلق العرش أين كان
ال

তিনি যদি কোনো স্থানে থাকতেন, বসা ও অবস্থান গ্রহণ করার দিকে মুখাপেক্ষী হতেন, তাহলে আরশ সৃষ্টির আগে আল্লাহ কোথায় ছিলেন?

আল্লাহ হলেন স্রষ্টা; আরশ হচ্ছে সৃষ্টি। আল্লাহ হচ্ছেন অনাদি; আরশের আদি ও সূচনা আছে। আল্লাহ নিত্য; আরশ অনিত্য। আল্লাহ অসীম; আরশ সসীম। আল্লাহ অবিনশ্বর; আরশ নশ্বর। আল্লাহ দেহহীন; আরশ দেহবান। আল্লাহ স্থান ও কালের বন্ধনমুক্ত; আরশ স্থান ও কালের বন্ধনযুক্ত। তাহলে আরশ কীভাবে আল্লাহ তাআলার আসন হয়? আল্লাহ তাআলার তো কোনো দেহই নেই; তাহলে আরশের ওপর তিনি কীভাবে উপবিষ্ট হন?

দিন যায় দ্বীন বেচে

যে সময়ে আরশ ছিল না, তখনো আল্লাহ ছিলেন। তখন তিনি যেমন ছিলেন, এখনো তেমন আছেন। আরশ সৃষ্টির পরে তাঁর অবস্থায় কোনো পরিবর্তন আসেনি; যেমনটা ওপরে ইমাম আহমাদ বলেছেন। কারণ, আল্লাহ তাআলার সকল গুণও তাঁর সত্তার মতো অপরিবর্তনশীল। এমন না যে, আরশ সৃষ্টির আগে তাঁর এক গুণ ছিল আর আরশ সৃষ্টির পরে তাঁর সেই গুণে পরিবর্তন এসেছে।

ইমাম আবু হানিফা রহ. বলেন :

وصفاته كلها في الأزل بخلاف صفات المخلوقين

আল্লাহর সকল গুণ অনাদিকাল থেকেই রয়েছে; পক্ষান্তরে মাখলুকের গুণের এর ব্যতিক্রম।

ইমাম আবু হানিফা রহ. বলেন :

كان الله ولا مكان، كان قبل أن يخلق الخلق كان ولم يكن أين ولا خلق ولا شيء وهو خالق كل شيء

যখন কোনো স্থানই ছিল না, তখনো আল্লাহ ছিলেন। গোটা সৃষ্টিকুলকে সৃষ্টি করার পূর্বে তিনি ছিলেন। তিনি তখনো ছিলেন, যখন ‘কোথায়’ বলার মতো জায়গা ছিল না, কোনো সৃষ্টি ছিল না এবং কোনো বস্তুই ছিল না। তিনিই সবকিছুর স্রষ্টা।

শায়খ লিখলেন যে, ‘আল্লাহ এত দূরে ও উচ্ছে’; এর দ্বারা আল্লাহ সম্পর্কে তার ধারণা ও আকিদা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। অথচ ইমাম আবু হানিফা রহ. বলেন :

দিন যায় দ্বীন বেচে

وليس قرب الله تعالى ولا بعده من طريق المسافة وقصرها ولكن على معنى الكرامة والهوان. والمطيع قريب منه بلا كيف، والعاصي بعيد عنه بلا كيف.

আল্লাহ তাআলার নৈকট্য ও দূরত্ব ব্যবধানের দৈর্ঘ্য ও সংক্ষিপ্ততার বিচারে নয়; বরং তা সম্মান ও তুচ্ছতার বিচারে। আনুগত্যকারী কোনো ধরন ছাড়া আল্লাহর নিকটবর্তী এবং পাপী কোনো ধরন ছাড়া আল্লাহ হতে দূরবর্তী।

আমি সবচে অবাক হলাম, ‘আল্লাহ আমাদের নিকটবর্তী’ এ কথাটিকে তিনি কিন্তু ঠিকই তাওয়িল করেছেন। অথচ তারা তাওয়িলকে সমর্থন করেন না। আল্লাহ আমাদের নিকটবর্তী - এ কথার মূল অর্থ কী? তাঁর সত্তার নৈকট্য নাকি গুণ তথা জ্ঞান ও দৃষ্টির নৈকট্য? তিনি এখানে তাওয়িল করে আলঙ্কারিক অর্থ গ্রহণ করলেন; অথচ বক্ষ্যমাণ বইয়ের শুরুতে তিনি মূলনীতি লিখেছেন (পৃ. ২১-২২) :

‘নাম ও গুণ বিষয়ক শব্দের প্রকাশ্য অর্থই বুঝতে হবে।... শব্দ শুনতেই যে অর্থের প্রতি আমাদের মস্তিষ্ক দৌড় দেয়, তা-ই হলো তার প্রকাশ্য অর্থ। তা-ই আমাদেরকে বিশ্বাস করতে হবে। উদাহরণস্বরূপ : হাত মানে শক্তি বা কবজা ইত্যাদি প্রায় সব ভাষায়ই ব্যবহার হয়। কিন্তু সেটা তার আসল ও প্রকাশ্য অর্থ নয়, সেটা তার রূপক বা আলঙ্কারিক অর্থ। মহান আল্লাহর সিফাতের ব্যাপারে রূপক বা আলঙ্কারিক অর্থ গ্রহণ করা বৈধ হবে না।’

মজার বিষয় হলো, তিনি নিজের মূলনীতি নিজেই রক্ষা করেননি। অন্যথায় তাঁর বলা উচিত ছিল, ‘আল্লাহ আরশের ওপরে’ এটাও যেমন মূল অর্থে; একইভাবে তিনি নিকটবর্তী এটাও মূল অর্থে। কিন্তু এটা না করে তিনি তাওয়িলের আশ্রয় নিয়েছেন। পিঠ বাঁচানোর জন্য কালামশাস্ত্রের দ্বারস্থ হয়েছেন। তাওয়িল তো শুধু এখানেই শেষ নয়।

দিন যায় দ্বীন বেচে

‘আল্লাহ আকাশে’ সেই কথারও তো তারা তাওয়িল করেন। কুরআনের সেই আয়াতের মূল অর্থ হলো ‘আল্লাহ আকাশে’; কিন্তু তারা এর ব্যাখ্যা করে সাব্যস্ত করেন, ‘আল্লাহ আকাশের ওপরে আরশে’। এটাও তো তাওয়িল। নিজে যার নিন্দা করেন, কীভাবে যেন সেই একই গর্তে আবার নিজেই পা দিয়ে বসেন। এটা তো বড়ই হাস্যকর বিষয়।

শায়খ আবু বকর যাকারিয়া

তাওহিদের দর্পণে শায়খ আবু বকর যাকারিয়া-০১

হককে বাতিল বলে ফিতনা ছড়ানো এবং বিদআতের পসরা সাজানো।

শায়খ সালিহ বিন ফাওজান ‘আকিদাতুত তাওহিদ’ নামে একটি বই রচনা করেছেন। সেই বইয়ের অনুবাদ করেছেন ড. মানজুরে ইলাহী। সম্পাদনা করেছেন শায়খ আবু বকর যাকারিয়া। বইটি ইসলাম হাউজ প্রকাশ করেছে। একই বই সম্ভবত সিয়ান পাবলিকেশনও প্রকাশ করেছে। ইসলাম হাউজ প্রকাশিত সংস্করণ আমাদের সামনে রয়েছে। এ বইয়ে কয়েক ধাপে হকপন্থীদের ওপর মিথ্যাচার করা হয়েছে, হককে বাতিল বলে আখ্যায়িত করে ফিতনা ছড়ানো হয়েছে, এমনকি আহলুস সুন্নাহকে মুশরিকদের উত্তরসূরি বলে অভিহিত করা হয়েছে।

প্রথম ধাপ, সেখানে রয়েছে (পৃ. ১১৪) :

যারা আল্লাহর নাম ও সিফাতকে অস্বীকার করে অথবা এর কিয়দংশ অস্বীকার করে তাদের কথার অপনোদন। এ ধরনের লোক তিন ভাগে বিভক্ত :

[১] জাহমিয়া : তারা হচ্ছে জাহম ইবন সাফওয়ান-এর অনুসারী। এরা আল্লাহর সকল নাম এবং সিফাতকে অস্বীকার করে।

দিন যায় দ্বীন বেচে

[২] মু'তাযিলা : তারা ওয়াসিল ইবন 'আতা-এর অনুসারী, যিনি হাসান আল-বাসরীর বৈঠক থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছিলেন। এরা আল্লাহর নাম সাব্যস্ত করে এ বিশ্বাসের ভিত্তিতে যে, এগুলো যাবতীয় অর্থ থেকে মুক্ত শব্দমালা মাত্র। আর তারা আল্লাহর সকল গুণাবলীকে অস্বীকার করে।

[৩] আশা'ইরাহ ও মাতুরিদিয়্যাহ এবং তাদের অনুসারীবৃন্দ : এরা আল্লাহর সকল নাম এবং কিছু সিফাতকে সাব্যস্ত করে আর বাকীগুলোকে অস্বীকার করে।...

এ মুশরিক ব্যক্তিরাই হচ্ছে জাহমিয়া, মু'তাযিলা, আশা'ইরা এমন প্রত্যেক অস্বীকারকারীর পূর্বসূরী, যারা আল্লাহর সে সব নাম ও গুণাবলীকে অস্বীকার করে যে সব নাম তিনি নিজেই সাব্যস্ত করেছেন অথবা তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর জন্য সাব্যস্ত করেছেন।

আর তারা (মুশরিকরা) খারাপ উত্তরসূরীর জন্য কতই না খারাপ পূর্বসূরী।

নিজেরা হাম্বলি হওয়ার দাবিদার হয়ে উম্মাহর সংখ্যাগরিষ্ঠ ইমামকে আহলুস সুন্নাহ থেকে খারিজ করতে এবং তাদেরকে মুশরিকদের উত্তরসূরি ভ্রাতা ও আল্লাহ তাআলার কিছু গুণ অস্বীকারকারী বলে আখ্যায়িত করতে কলিজা লাগে। শায়খ সালেহ ফাওজান, মানজুরে এলাহী এবং আবু বকর জাকারিয়ার সে কলিজা আছে। প্রথমত একনজর দেখে নেওয়া প্রয়োজন, তারা কাদের ওপর এত বড় জুলুম করলেন। সেই মনীষীরা কারা? পূর্বের পোস্টে আমরা তাদের মধ্যে সবিশেষ উল্লেখযোগ্য কয়েকজনের ওপর আলোকপাত করেছি; যাদের ছাড়া এই যুগের মুহাক্কিকরা অচল। পোস্টের লিংক : <https://bit.ly/2WsVOgw> ।

দিন যায় দ্বীন বেচে

আমি অবাক হই, এঁরা কত সহজে সংখ্যাগরিষ্ঠ উম্মাহকে আহলুস সুন্নাহ থেকে খারিজ করে দেয়; অথচ ইমাম আহমদ ইবনু হাম্বল রহ.-এর আদর্শ এমন নয়।

ইমাম আহমদ রহ. বলেন:

إِخْرَاجُ النَّاسِ مِنَ السُّنَّةِ شَدِيدٌ

মানুষকে আহলুস সুন্নাহ থেকে খারিজ করে দেওয়া গুরুতর ব্যাপার।

অন্য বর্ণনায় এসেছে:

قُلْتُ: فَمَا تَقُولُ فِيمَنْ لَمْ يَثْبُتْ خِلَافَةٌ عَلَيْهِ؟ قَالَ: بِئْسَ الْقَوْلُ هَذَا.
قُلْتُ: يَكُونُ مِنْ أَهْلِ السُّنَّةِ؟ قَالَ: «مَا أَجْتَرَى أَنْ أُخْرِجَهُ مِنَ السُّنَّةِ،
تَأْوِلَ فَأَخْطَأُ»

আমি ইমাম আহমদকে জিজ্ঞেস করলাম, যে ব্যক্তি আলি রা.-এর খিলাফত সাব্যস্ত করে না, তার ব্যাপারে আপনার কী মত? তিনি বললেন, এটা অনেক নিকৃষ্ট কথা। আমি জিজ্ঞেস করলাম, সে কি আহলুস সুন্নাহর অন্তর্ভুক্ত থাকবে? তিনি বললেন, আমি তাকে আহলুস সুন্নাহ থেকে খারিজ করে দেওয়ার দুঃসাহস করি না। সে তাওয়িল করেছে, অনন্তর (তাওয়িলে) ভুল করেছে।

এঁরা তো নিজেদেরকে আসারি দাবি করে। তাহলে একবার দেখে নিই, পূর্ববর্তী আসারিরা এদের নির্দয় হাতে অভিযুক্তদের ব্যাপারে কী বলতেন।

ইমাম সাফারিনি হাম্বলি রহ. লেখেন :

- أَهْلُ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ ثَلَاثُ فِرَقٍ: الْأَثَرِيَّةُ وَإِمَامُهُمْ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ،
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، وَالْأَشْعَرِيَّةُ وَإِمَامُهُمْ أَبُو الْحَسَنِ الْأَشْعَرِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ،

দিন যায় দ্বীন বেচে

وَالْمَاتَرِيدِيَّةُ وَإِمَامُهُمْ أَبُو مَنصُورٍ الْمَاتَرِيدِيُّ، وَأَمَّا فِرْقَةُ الضَّالِّالِ
فَكثِيرَةٌ جَدًّا

আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআত হলো তিন দল :

(ক) আসারি; যাদের ইমাম হলেন আহমদ ইবনু হাম্বল রহ.।

(খ) আশআরি; যাদের ইমাম হলেন আবুল হাসান আশআরি রহ.।

(গ) মাতুরিদি; যাদের ইমাম হলেন আবু মানসুর মাতুরিদি রহ.।

আর গোমরাহ দল তো অনেক।

আল্লামা ইবনুশ শাততি ‘তাবসিরুল কানি’ গ্রন্থে (পৃ. ৭২), আল্লামা ইবনুস সাব্বুম ‘শারহুদ দুররাতিল মুজিয়াহ’ গ্রন্থে ইমাম সাফারিনি রহ. -এর সঙ্গে ঐকমত্য পোষণ করেন।

এছাড়াও সাফারিনি রহ. তার উক্ত গ্রন্থের তিন জায়গায় আশআরি-মাতুরিদিদের উদ্ধৃতিতে তাদের অভিমত উল্লেখ করেছেন।

আল্লামা আবদুল বাকি মাওয়াহিব হাম্বলি রহ. ‘আল-আইনু ওয়াল আসার ফি আকায়িদি আহলিল আসার’ (পৃ. ৫৩) লেখেন :

إن طوائف أهل السنة ثلاث: أشاعرة وحنابلة وماتريدية.

আহলুস সুন্নাহর দল হলো তিনটা : আশআরি, হাম্বলি ও মাতুরিদি।

আল্লামা আহমাদ ইবনু আবদিল্লাহ মারদাওয়াই হাম্বলি রহ. ‘লামিয়াতু ইবনি তাইমিয়া’র ব্যাখ্যাগ্রন্থে (পৃ. ১৮২) লেখেন :

هذه العقيدة مما اتفق عليها الأئمة الأربعة وممن حكي عنهم مقالات السلف ممن تقدم ذكره، فكل منهم على حق؛ وإن كان قد وقع الخلا

দিন যায় দ্বীন বেচে

اف بين الشيخ أبي الحسن الأشعري شيخ أهل السنة من الشافعية وغيرهم وبين الإمام أبي حنيفة في آخر من مسائل أصول الدين؛ لكنها يسيرة لا تقتضي تكفيرا ولا تبديعا.

এই আকিদার ব্যাপারে চার ইমাম এবং পূর্বে যেসব সালাফের উক্তি বর্ণিত হয়েছে তারা সকলে একমত। সুতরাং তারা সকলেই হকের ওপর রয়েছেন। যদিও শাফেয়ি ও অন্যান্য আহলুস সুন্নাহর শায়খ ইমাম আবুল হাসান আশআরি এবং ইমাম আবু হানিফার মধ্যে আকিদার কিছু মাসআলায় ইখতিলাফ হয়েছে; তবে তা নগণ্য, যা তাকফির (কাফির বলা) বা তাবদি (বিদআতি আখ্যায়িত করা) দাবি করে না।

আল্লামা আবদুল্লাহ ইবনু আওদা কাদুমি হাম্বলি রহ. ‘আল-মানহাজুল আহমাদ ফি দারয়িল মাসালিবিলা লাতি তুনমা লি-মাযহাবিল ইমাম আহমাদ’ গ্রন্থে লেখেন :

،(فإن هذه الفرق الثلاث هم المعبر عنهم ب(أهل السنة والجماعة وهم أهل الظهور في جميع الأعصار والأصوار، وهم الطائفة المنصورة، وهم السواد الأعظم

এই তিনও দলকে আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআত বলে ব্যক্ত করা হয়। সর্বযুগে সব এলাকায় তারাই প্রতিষ্ঠিত। তারাই তায়েফায়ে মানসুরা (সাহায্যপ্রাপ্ত দল)। তারাই সাওয়াদে আজাম (সংখ্যাগরিষ্ঠ উম্মাহ)।

এরপর লেখেন:

أهل الحديث والأشعرية والماتريدية فرقة واحدة متفقون في أصول الدين... والخلاف بينهم في مسائل قليلة.

আহলুল হাদিস, আশআরি ও মাতুরিদিরা মূলত এক দল; যারা আকিদার বিষয়ে একমত। ইখতিলাফ হলো তাদের মধ্যে মাত্র অল্প

দিন যায় দ্বীন বেচে

কিছু মাসআলায়।

এমনকি আবু ইয়াল্লা হাম্বলি রহ. তার ‘আল-মুতামাদ’ গ্রন্থে আহলুল হাদিস এবং আশআরিদের ইজমা উদ্ধৃত করেছেন। তার সূত্রে তার পুত্র ‘আবাকাতুল হানাবিলা’ গ্রন্থে (২/২১০) সেই মত উদ্ধৃতও করেছেন।

ইমাম ইবনু আসাকির রহ. ‘আবয়িনু কাযিবিল মুফতারি’ গ্রন্থে (পৃ. ১৬৩) এই বাস্তবতাটিকেই বড় সুন্দরভাবে তুলে ধরেছেন :

وتبينوا فضل أبي الحسن واعرفوا إنصافه واسمعوا وصفه لأحمد
بالفضل واعترافه ليتعلموا أنهم كانوا في الاعتقاد متفقين وفي أصول
الدين ومذهب السنة غير مفترقين ولم تزل الحنابلة يبتعدون في قديم
الزهر على ممر الأوقات تعتضد بالأشعرية على أصحاب البدع لأن
نهم المتكلمون من أهل الإثبات فمن تكلم منهم في الرد على
مبتدع فلبسان الأشعرية يتكلم ومن حقق منهم في الأصول في
مسألة فمنهم يتعلم.

তোমরা আবুল হাসান আশআরির মর্যাদা যাচাই করো, তার ইনসাফ সম্পর্কে জানো, ইমাম আহমদকে তিনি যে মর্যাদার গুণে গুণান্বিত করেছেন তা শোনো এবং তার স্বীকৃতিও জেনে নাও; যাতে তোমরা বুঝতে পারো যে, আকিদার ক্ষেত্রে তারা উভয়ে একমত ছিলেন। দীনের মূল বিষয়সমূহ এবং আহলুস সুন্নাহর মাযহাবে তারা আলাদা ছিলেন না। বাগদাদে অবস্থানরত হাম্বলিরা পূর্বের যুগগুলোতে বিদআতিদের খণ্ডন করার জন্য অব্যাহতভাবে আশআরি মাযহাব আঁকড়ে রেখেছিল। কারণ, (আল্লাহর গুণাবলি) সাব্যস্তকারীদের মধ্যে তারাই মুতাকাল্লিম। সুতরাং হাম্বলিদের মধ্যে যে-কেউ বিদআতির রদ করার জন্য কালাম করত, সে-ই আশআরি মাযহাবের ভাষায় কালাম করত। হাম্বলিদের মধ্যে যে-কেউ আকিদার মাসআলা তাহকিক করত, সে আশআরিদের থেকেই শিখে নিত।

দিন যায় দ্বীন বেচে

এই প্রয়োজনীয় ভূমিকার পরে এবার আমরা ইনসাফের নিক্তিতে অভিযোগকারীদের অভিযোগের মূল পয়েন্টগুলো বিশ্লেষণ করে দেখব এবং বাস্তবতার সঙ্গে সেগুলোর সামঞ্জস্য মেলাব।

শায়খ আবু বকর যাকারিয়া-০২

শায়খত্রয় যে আশআরি ও মাতুরিদিদেরকে আল্লাহ তাআলার কিছু সিফাত অস্বীকারকারী সাব্যস্ত করলেন, এর পক্ষে তাদের দলিল হলো নিম্নরূপ :

তারা দু'টোর যে কোনো একটি পথ অবলম্বন করেছে-

১। তারা এ সকল নাম ও গুণাবলীর ব্যাপারে কুরআন ও হাদিসের যে বক্তব্য রয়েছে, সেগুলোকে তাদের প্রকাশ্য অর্থ থেকে তা'বিল বা ভিন্নখাতে প্রবাহিত করে; যেমন তারা ওয়াজহ বা মুখমণ্ডলকে তা'বিল বা ভিন্ন খাতে প্রবাহিত করে আল্লাহর জাত বা সত্ত্বা দ্বারা, ইয়াদকে তা'বিল করে নিয়ামত দ্বারা।

২। তারা নাম ও সিফাত সম্পর্কিত কুরআন ও হাদিসের বক্তব্যগুলোকে আল্লাহর প্রতি সমর্পণ করে এবং বলে যে, এগুলো দ্বারা কি উদ্দেশ্য আল্লাহই ভালো জানেন, আমাদের বোধগম্য নয়। আর এ আকীদা তারা পোষণ করে যে, এ নাম এবং গুণাবলী সম্পর্কে কুরআন ও হাদিসের বক্তব্যসমূহ দ্বারা প্রকাশ্য অর্থ বুঝানো হয় নি।

সম্পাদক শায়খ আবু বকর যাকারিয়া এর দ্বিতীয় যুক্তিটির সঙ্গে আবার একটি টীকা যোগ করেন। তিনি লেখেন :

পূর্বেই বলা হয়েছে যে, এটি সঠিক পদ্ধতি নয়, এটি ভুল বিশ্বাস। কারণ, আল্লাহ তা'আলার কুরআন ও রাসূলের সুন্নাহত কোনো ধাঁধা গ্রন্থ নয় যে, এখানে এমন কিছু থাকবে যে, তার প্রকাশ্য অর্থ করা যাবে না, আর

দিন যায় দ্বীন বেচে

তার অর্থ বুঝা যাবে না।

উপরউক্ত উদ্ধৃতির আলোকে প্রতিভাত হচ্ছে, তারা আশআরি ও মাতুরিদিদেরকে সিফাত অস্বীকারকারী সাব্যস্ত করার পেছনে মূল যুক্তি দুটো : (ক) তাওয়িল। (খ) তাফউইদ। তার মানে যারা তাওয়িল বা তাফউইদ করে, তারা প্রকরাস্তরে সিফাতকে অস্বীকার করে। এক্ষেত্রে তারা তাওয়িলের ব্যাখ্যা করেছেন ‘ভিন্নখাতে প্রবাহিত করে’ বলে।

তাওয়িল কী?

ইমাম আমিদি রহ. (মৃত্যু : ৬৩১ হিজরি) বলেন :

التأويل المقبول الصحيح: فهو حمل اللفظ على غير مدلوله الظاهر منه مع احتماله له بدليل يعضده.

গ্রহণযোগ্য বিশুদ্ধ তাওয়িল হলো, শব্দকে শক্তিশালী কোনো দলিলের কারণে তার বাহ্যিক অর্থ ছাড়া এমন কোনো অর্থে প্রয়োগ করা, যার সম্ভাবনা শব্দের ভেতরে রয়েছে। [আল-ইহকাম : ৩/৫৯]

যেহেতু শায়খত্রয় নিজেদেরকে আসারি দাবি করেন, তাই আমরা আসারি ইমামদের আলোকেই তাদের অভিযোগ বিশ্লেষণ করে দেখব, তারা কি যোগ্য পূর্বসূরির প্রকৃত উত্তরসূরি, নাকি তারা আসারি ইমামদের নাম বিকিয়ে খাওয়া নব্য কোনো গোষ্ঠী।

ইমাম ইবনু কুদামা রহ. (মৃত্যু : ৬২০ হিজরি) তাওয়িলের পরিচয় দিতে গিয়ে লেখেন :

والتأويل صرف اللفظ عن الاحتمال الظاهر إلى احتمال مرجوح به لا عتضاده بدليل يصير به أغلب على الظن من المعنى الذي دل عليه الظاهر إلا أن الاحتمال يقرب تارة ويبعد أخرى وقد يكون الاحتمال

দিন যায় দ্বীন বেচে

بعيدا جدا فيحتاج إلى دليل في غاية القوة وقد يكون قريبا فيكفيه أدنى دليل وقد يتوسط بين الدرجتين فيحتاج دليلا متوسطا

তাওয়িল হলো শব্দকে প্রকাশ্য সম্ভাবনা থেকে সরিয়ে কোনো অপ্রধান সম্ভাবনার দিকে ফেরানো—কোনো দলিলের আলোকে সেই অপ্রধান সম্ভাবনা শক্তিশালী হওয়ার কারণে, যে দলিলের দ্বারা শাস্তিক অর্থের তুলনায় তা-ই ধারণার ওপর প্রবল হয়। তবে সম্ভাবনা কখনো নিকটবর্তী হয়, কখনো দূরবর্তী হয়, কখনো খুব বেশি দূরবর্তী হয়। সেক্ষেত্রে সর্বোচ্চ শক্তিশালী দলিলের প্রয়োজন হয়। আর কখনো সেই সম্ভাবনা নিকটবর্তী হয়। তখন সাধারণ দলিল এর জন্য যথেষ্ট হয়ে যায়। আর কখনো তা মাঝামাঝি পর্যায়ে হয়, তখন মাঝামাঝি পর্যায়ে দলিলের প্রয়োজন হয়। [রাওজাতুন নাজির : ১৭৮]

ইমাম তুফি রহ. (মৃত্যু : ৭১৬ হিজরি) লেখেন :

صرف اللفظ عن ظاهره لدليل يصير به المرجوح راجحا. فاظواهر الواردة في الكتاب والسنة في صفات البارئ جل جلاله، لنا أن نسكت عنها، ولنا أن نتكلم فيها. فإن سكنا عنها قلنا: تمر كما جاءت، كما نقل عن الإمام أحمد رضي الله عنه وسائر أعيان أئمة السلف وإن تكلمنا فيها، قلنا: هي على ظواهرها من غير تحريف ما لم يقيم دليل يترجح عليها بالتأويل.

শব্দকে এমন কোনো দলিলের কারণে তার বাহ্যিক অর্থ থেকে সরিয়ে দেওয়া, যার দ্বারা অপ্রধান সম্ভাবনা প্রাধান্যপ্রাপ্ত হয়। সুতরাং কুরআন-সুন্নাহয় মহান আল্লাহ তাআলার গুণাবলির ব্যাপারে যে সমস্ত বাহ্যিক শব্দ এসেছে—আমাদের সুযোগ রয়েছে সে ব্যাপারে নীরব থাকা এবং সুযোগ রয়েছে সে ব্যাপারে কথা বলা। যদি আমরা নীরব থাকি, তাহলে বলব, শব্দগুলো যেভাবে এসেছে, সেভাবে রেখে দেওয়া হবে; যেমনটা ইমাম আহমদ রহ.-সহ সালাফের অন্য সকল বিশিষ্ট ইমাম থেকে বর্ণিত

দিন যায় দ্বীন বেচে

হয়েছে। আর যদি কথা বলি, তাহলে আমরা বলব, শব্দগুলো কোনোপ্রকার বিকৃতি ছাড়া তার বাহ্যিক অর্থে প্রযোজ্য হবে, যতক্ষণ না এমন দলিল প্রতিষ্ঠিত হয়, যা বাহ্যিকে অর্থের ওপর তাওয়িলকে প্রাধান্য দেয়। [শারহ মুখতাসারির রাওজাহ : ৫৬২]

ইমাম মারঈ কারঈ হাম্বলি রহ.- (মৃত্যু : ১০৩৩ হিজরি)-ও একই কথা লেখেন :

والتأويل هو أن يراد باللفظ ما يخالف ظاهره أو هو صرف اللفظ عن ظاهره لمعنى آخر. وهو في القرآن كثير؛ ومن ذلك آيات الصفات المقدسة، وهي من الآيات المتشابهات.

তাওয়িল হলো কোনো শব্দ দ্বারা এমন অর্থ উদ্দেশ্য নেওয়া, যা তার বাহ্যিক অর্থের বিপরীত অথবা তাওয়িল হলো, শব্দকে তার বাহ্যিক অর্থ থেকে অন্য কোনো অর্থের দিকে ফিরিয়ে নেওয়া। কুরআনে তা রয়েছে প্রচুর। তন্মধ্যে আল্লাহ তাআলার পবিত্র গুণাবলি-সংক্রান্ত আয়াতসমূহও অন্তর্ভুক্ত। আর সিফাতের এসব আয়াত মুতাশাবিহ (দ্ব্যর্থবোধক) আয়াতসমূহের অন্তর্ভুক্ত। [আকাওয়িলুস সিকাত : ৪৮]

আল্লামা ইবনুন নাজ্জার রহ. (মৃত্যু : ৯৭২ হিজরি)-ও ‘শারহুল কাওকাবিল মুনির’ গ্রন্থে একই কথা লিখেছেন। বলা বাহুল্য, আশআরি ও মাতুরিদিরা যেই তাওয়িল গ্রহণ করেছে, তা হলো এই তাওয়িল। অন্যথায় তাওয়িলে ফাসিদ তথা গলদ তাওয়িল যেটা, তা তারা কখনোই গ্রহণ করেনি। সেগুলো গ্রহণ করেছে রাফেজিসহ অন্যান্য গোমরাহ সম্প্রদায়। যেমন, সুরা রহমানের ১৯ নম্বর আয়াতের ‘বাহরাইন’ (দুই সমুদ্র) শব্দের তাওয়িল তারা করেছে আলি ও ফাতিমা রা.। একই সুরার ২২ নম্বর আয়াতের ‘আল-লু’লু’ ওয়াল মারজান’ শব্দের তাওয়িল তারা করেছে হাসান ও হুসাইন রা.। সুরা বাকারাহর ২০৫ নম্বর আয়াতের নিন্দিত লোকটির তাওয়িল করেছে মুয়াবিয়া রা.। এ ধরনের

দিন যায় দ্বীন বেচে

মনগড়া তাওয়িলের ব্যাপারে ইমামগণ সর্বদা সতর্ক করে গেছেন। [উদাহরণস্বরূপ দৃষ্টব্য—আল-বুরহান : ২/১৫২] কিন্তু আশআরি-মাতুরিদীরা কিছুক্ষেত্রে যে তাওয়িল করেছে, তা কখনোই এরকম নয়। বরং তা উল্লিখিত সংজ্ঞাসমূহে বিবৃত তাওয়িল। এ ধরনের তাওয়িল তারাই উদ্ভাবন করেনি; বরং সাহাবাযুগ থেকেই তা চলে আসছে। এর ওপর কেউ আপত্তি তুলে সেই আপত্তি সাহাবীদের গায়ে গিয়েও পড়বে।

ইমাম আমিদি রহ. . (মৃত্যু : ৬৩১ হিজরি) লেখেন :

وإذا عرف معنى التأويل فهو مقبول معمول به إذا تحقق بشروطه،
ولم يزل علماء الأمصار في كل عصر من عهد الصحابة رضي الله
عنهم إلى زمننا عاملين به من غير تكير.

তাওয়িলের অর্থ যখন জানা হলো, তখন (এ কথাও জেনে রাখা প্রয়োজন যে,) যখন শর্ত বাস্তবায়িত হবে, তখন তাওয়িল গ্রহণযোগ্য ও আমলযোগ্য হবে। সাহাবাযুগ থেকে বর্তমান কাল পর্যন্ত সর্বযুগে সব এলাকার আলিমরা কোনো ধরনের আপত্তি ছাড়া এর ওপর অব্যাহতভাবে আমল করে আসছেন। [আল-ইহকাম : ৩/৬০]

এবার পাঠক, আপনিই বলতে পারবেন, সালাফি নাম ধারণ করে সালাফদের স্বীকৃত মানহাজের ওপর আপত্তি করাই কি সালাফিদের বৈশিষ্ট্য হওয়া উচিত নাকি বিনা বাক্যব্যয়ে তা মেনে নেওয়া তাদের স্বভাববৈশিষ্ট্য হওয়া উচিত?

এখানে আমরা সালাফে সালাহিন বলতে প্রথমে যাদেরকে বোঝায়, তাদের কিছু তাওয়িলের দৃষ্টান্ত উল্লেখ করতে পারি। আবদুল্লাহ ইবনু আব্বাস রা. ও দাহহাক রহ. আল্লাহ তাআলার ‘আসা’ (الأتیان)-কে তাওয়িল করেছেন—তাঁর ‘নির্দেশ’ আসবে। [কুরতুবি : ৭/১২৯]

হাসান বসরি রহ. তাঁর ‘আগমন’ (المجيئ)-কে তাওয়িল

দিন যায় দ্বীন বেচে

করেছেন—তাঁর আদেশ ও সিদ্ধান্তের আগমন হবে। [বাগাওয়ি : ৪/৪৫৪]

আবদুল্লাহ ইবনু আব্বাস রা. ও আরও অনেকে ‘কুরসি’কে তাওয়িল করেছেন ‘ইলম’ বলে। [ইবনু আবি হাতিম : ২/৪৯০]

ইবনু আব্বাস রা., মুজাহিদ ও দাহহাক রহ. পায়ের গোছা (ساق)-কে তাওয়িল করেছেন অবস্থার বিভীষিকা ও প্রচণ্ডতা বলে। [তাবারি, ইবনু আবি হাতিম প্রভৃতি]

ইবনু আব্বাস রা.-সহ আরও অনেকে হাতসমূহ (أيد)-কে তাওয়িল করেছেন ‘শক্তি’ দ্বারা। [তাবারি : ১১/৪৭২]

আ‘মাশ রহ. দ্রুত চলা (هولة)-কে তাওয়িল করেছেন ক্ষমা ও রহমত দ্বারা। [তিরমিজি : ৫/৫৮১]

আবদুল্লাহ ইবনু মুবারক রহ. ‘আল্লাহর পার্শ্ব’ (كنف)-কে তাওয়িল করেছেন ‘ছায়া ও আশ্রয়’ দ্বারা। [খালকু আফআলিল ইবাদ, বুখারি : ৭৮]

ইমাম মালিক রহ. ‘আল্লাহর নেমে আসা’ (نزول)-কে তাওয়িল করেছেন ‘নির্দেশ ও রহমত নাজিল হওয়া’ দ্বারা। [আত-তামহিদ : ৭/১৪৩; সিয়্যার : ৮/১০৫]

হাসান বসরি ও নজর ইবনু শুমায়ল রহ. ‘আল্লাহর পা’ (قدم)-কে তাওয়িল করেছেন ‘পূর্বে যাদের ব্যাপারে ইলম রয়েছে’ বলে। [আসমা-সিফাত, বায়হাকি : ৩৫২; দাফউ শুবাহিত তাশবিহ : ৮১ ইবনু হিব্বান রহ. একই শব্দের তাওয়িল করেছেন ‘স্থান’ দ্বারা। সহিহ ইবনু হিব্বান : ১/৫০২] সুফয়ান ইবনু উয়ায়না রহ. ‘রহমানের পদক্ষেপ’ (وطة)-কে তাওয়িল করেছেন বিজয় ও সাহায্য দ্বারা। [তাওয়িলু মুখতালিফিল হাদিস, ইবনু কুতায়বা : ২১৩]

দিন যায় দ্বীন বেচে

মুজাহিদ ও শাফিয়ি রহ. 'যেদিকে মুখ ফেরাও না কেন, সেদিকেই আল্লাহর চেহারা রয়েছে' (فتم وجه الله)-কে তাওয়িল করেছেন—সেদিকেই আল্লাহর কিবলা রয়েছে। [মাজমুউল ফাতাওয়া, ইবনু তাইমিয়া] এছাড়াও আবু উবায়দ কাসিম ইবনু সাল্লাম থেকেও তাওয়িল বর্ণিত রয়েছে। [লিসানুল আরব : ১/২০৬]

এখন কি শায়খত্রয় সাহাবি, তাবেয়ি ও তাবে তাবেয়ীদেরকেও আহলুস সুন্নাহ থেকে খারিজ করে দেবেন? তাদেরকে কিছু সিফাত অস্বীকারকারী বলে আখ্যায়িত করবেন? তথাপি কথা হলো, কিছু তাওয়িল তো এতটাই অপরিহার্য যে, কেউ যদি তা না করে, তাহলে সে কাফির হয়ে যাবে। এসব ক্ষেত্রে ইমাম আহমদ ইবনু হাম্বল রহ.-ও তাওয়িল করেছেন। বিভিন্ন আয়াত ও হাদিসে বর্ণিত যে সকল সিফাত বাহ্যিক অর্থে আল্লাহ তাআলার জন্য দোষ-ত্রুটি অপরিহার্য করে, সেগুলোকে আবশ্যিকভাবে তাওয়িল করতে হবে।

যেমন, এক হাদিসে আছে, 'বান্দা আমি অসুস্থ হয়েছিলাম, তুমি আমার শুশ্রূষা করোনি'। [সহিহ মুসলিম : ৪/১৯৯০; সহিহ ইবনু হিব্বান : ১/৫০৩]

কুরআনে এসেছে, 'তারা আল্লাহকে ভুলে গেছে। তাই তিনিও তাদেরকে ভুলে গেছেন।' [তাওবা : ৬৭] নিশ্চয়ই যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসুলকে কষ্ট দেয়...।' [আহযাব : ৫৭]

এখনকি এসকল আয়াতের আলোকে অর্থব্ধ অক্ষরবাদীরা দাবি করে বসবে যে, অসুস্থ হওয়া, ভুলে যাওয়া এবং কষ্ট পাওয়া আল্লাহ তাআলার সিফাত (গুণ)? তিনি অসুস্থ হন, তবে আমাদের অসুস্থতার মতো নয়; তিনি ভুলে যান, তবে আমাদের ভুলে যাওয়ার মতো নয়; তিনি কষ্ট পান, তবে আমাদের কষ্ট পাওয়ার মতো নয়। নাউজুবিল্লাহ।

দিন যায় দ্বীন বেচে

ইমাম আহমদ ইবনু হাম্বল রহ. লেখেন :

أما قوله: {الْيَوْمَ نَسْأَلُكُمْ كَمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا} يقول: نترككم في النار {كما نسيتم} كما تركتم العمل للقاء يومكم هذا.

কুরআনের আয়াত—‘আজ আমি তোমাদেরকে সেভাবে ভুলে যাব, যেভাবে তোমরা এই দিনের সাক্ষাতের কথা ভুলে গিয়েছিলে’। এই আয়াতে আল্লাহ বলছেন, আমি তোমাদেরকে জাহান্নামে ছেড়ে দেবো, যেভাবে তোমরা এই দিনের সাক্ষাতের জন্য আমল করা ছেড়ে দিয়েছিলে। [আর-রাদু আলায যানাদিকা : ১৭]

{وقال في آية أخرى: {إنا معكم مُسْتَمِعُونَ}. أما قوله: {إنا معكم} فهذا في مجاز اللغة، يقول الرجل للرجل: إنا سنجري عليك رزقا، إنا سنفعل بك كذا. وأما قوله: {إني معكما أسمع وأرى} فهو جائز في اللغة، يقول الرجل الواحد للرجل: سأجري عليك رزقا، أو سأفعل بك خيرا.

আল্লাহ তাআলা অপর এক আয়াতে বলেন—‘আমি তোমাদের সঙ্গে শুনব।’ ‘আমি তোমাদের সঙ্গে’ এটা ভাষার রূপক ব্যবহার। এক ব্যক্তি আরেক ব্যক্তিকে বলে, আমি তোমার ওপর রিজিক জারি করব। আমি তোমাকে এরূপ এরূপ করব। আরেক আয়াত—‘আমি তোমাদের দুজনের সঙ্গে থেকে শুনব ও দেখব’। এটা ভাষাতত্ত্ব অনুসারে বৈধ। এক ব্যক্তি আরেক ব্যক্তিকে বলে, আমি তোমার ওপর রিজিক জারি করব। আমি তোমার সঙ্গে ভালো আচরণ করব। [প্রাগুক্ত : ১৯]

শায়খত্রয় যেই যুক্তিতে আশআরি ও মাতুরিদিদেরকে আহলুস সুন্নাহ থেকে খারিজ করে সিফাত অস্বীকারকারী সাব্যস্ত করেছেন, একই যুক্তিতে তো ইমাম আহমদ রহ.-ও আহলুস সুন্নাহ থেকে খারিজ হয়ে সিফাত অস্বীকারকারী সাব্যস্ত হন। এক্ষেত্রে তারা কি ডাবল স্ট্যান্ডার্ডের পরিচয় দেবেন নাকি সবার সঙ্গে একই আচরণ করার

দিন যায় দ্বীন বেচে

সংসাহস করবেন?

ইমাম আহমাদ রহ. শুধু যে এই দুটো তাবিল করেছেন, এমন নয়। কয়েক ডজন তাওয়িল তার থেকে বর্ণিত রয়েছে। অন্যান্য আসারি ইমামরাও যুগে যুগে তাওয়িল করে গেছেন। সুতরাং তাওয়িল অপরাধ হলে তারা সকলেই অপরাধী। বিস্তারিত আলোচনা পরবর্তী পর্বে দ্রষ্টব্য।

শায়খ আবু বকর যাকারিয়া ০৩

তবে কি ইমাম আহমদও আহলুস-সুন্নাহ বহির্ভূত কালামি?

আগের পর্বে আমরা ইমাম আহমদের কিছু তাওয়িলের বিবরণ উল্লেখ করেছি। এই পর্বে তার আরও কিছু তাওয়িলের দৃষ্টান্ত উল্লেখ করব। এক-দুটো দৃষ্টান্ত দেখলে অনেকের মনে আবার সংশয় থেকে যায়। তাই বিষয়টি স্পষ্ট হওয়া প্রয়োজন।

ইমাম ইবনু হামদান হাম্বলি রহ. (মৃত্যু : ৬৯৫ হিজরি) লেখেন :

"وقد تأول أحمد آيات وأحاديث كآية النجوى وقوله "أن يأتيهم الله وقال: قدرته وأمره. وقوله "وجاء ربك" قال: قدرته. ذكرهما ابن الجوزي في المنهاج واختار هو إمرار الآيات كما جاءت من غير تفسير. وتأول ابن عقيل كثيرا من الآيات والأخبار. وتأول أحمد قول النبي ﷺ "الحجر الأسود يمين الله في الأرض" ونحوه

ইমাম আহমদ অনেক আয়াত ও হাদিসের তাওয়িল করেছেন। যেমন : গোপন কথার আয়াত। (মুজাদালা : ৭)

‘কখনো তিনজনের মধ্যে এমন কোনো গোপন কথা হয় না, যাতে চতুর্থজন হিসেবে আল্লাহ উপস্থিত থাকেন না এবং কখনো পাঁচজনের মধ্যে এমন কোনো গোপন কথা হয় না, যাতে ষষ্ঠজন হিসেবে তিনি

দিন যায় দ্বীন বেচে

উপস্থিত না থাকেন। এমনভাবে তারা এর কম হোক বা বেশি, তারা যেখানেই থাকুক, আল্লাহ তাদের সঙ্গে থাকেন।’)

‘তাদের কাছে আল্লাহ আসবেন’ (বাকারা : ২১০)-এর তাওয়িল করেছেন, ‘তাঁর কুদরত ও নির্দেশ আসবে’।

‘তোমার প্রতিপালক এসেছেন’ (ফাজর : ২২)-এর তাওয়িল করেছেন ‘তাঁর কুদরত এসেছে’।

এ দুটো ইবনুল জাওযি রহ. আল-মিনহাজ গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। তিনি এই মাযহাব গ্রহণ করেছেন যে, শব্দকে কোনো ব্যাখ্যা না করে যেভাবে এসেছে সেভাবে রেখে দেওয়া হবে।

ইবনু আকিল রহ.-ও অনেক আয়াত ও হাদিসের তাওয়িল করেছেন। ‘হাজরে আসওয়াদ পৃথিবীতে আল্লাহর ডান হাত’—ইমাম আহমদ রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর এই হাদিসসহ অন্যান্য হাদিসেরও তাওয়িল করেছেন। [নিহায়াতুল মুবতাদিয়িন : ৩৫]

বলা বাহুল্য, উপরিউক্ত প্রথম তাওয়িলটি কিন্তু নির্বিশেষে সব আসারি গ্রহণ করেছে। আপনি শায়খত্রয়কে যদি জিজ্ঞেস করেন, আল্লাহ কি সর্বত্র বিরাজমান? তারা বলবেন, কখনোই না। যদি জিজ্ঞেস করেন, এই আয়াতের বাহ্যিক অর্থ থেকে তো এমনটাই তো বোঝা যায়। তারা উত্তরে বলবেন, এর তাওয়িল হচ্ছে, আল্লাহর জ্ঞান ও কুদরত সর্বত্র বিরাজমান। যে তাওয়িলের অভিযোগ চাপিয়ে তারা আশআরি-মাতুরিদিদেরকে আহলুস সুন্নাহ থেকে খারিজ করে সিফাত অস্বীকারকারী সাব্যস্ত করলেন, একই অভিযোগে হরহামেশা তারাও কিন্তু অভিযুক্ত হওয়ার উপযুক্ততা রাখেন। কিন্তু অজ্ঞতার দরুন কেউ এই প্রশ্ন তোলে না। তাই বছরের পর বছর মূর্খতার একচ্ছত্র দাপটই চলে সমাজে।

দিন যায় দ্বীন বেচে

ইমাম ইবনু হামদান ও ইমাম ইবনুল জাওযি ছাড়াও ইমাম আবু ইয়াল্লা ও ইমাম ইবনু কুতায়বা প্রমুখও তাঁর তাওয়িলের বিভিন্ন বিবরণ উল্লেখ করেছেন। ইমাম গাজালি রহ.-এর লেখায় বিষয়টি সুন্দরভাবে উঠে এসেছে:

قد سمعت الثقات من أئمة الحنابلة ببغداد يقولون: إن أحمد بن حنبل رحمه الله صرح بتأويل ثلاثة أحاديث فقط. أحدها: قوله صلى الله عليه وسلم: (الحجر الأسود يمين الله في الأرض). و الثاني: قوله صلى الله عليه وسلم: (قلب المؤمن بين أصبعين من أصابع الرحمن). والثالث: قوله صلى الله عليه وسلم: (إني لأجد نفس الرحمن من قبل اليمن).

আমি বাগদাদে অবস্থানরত নির্ভরযোগ্য হাম্বলি ইমামদেরকে বলতে শুনেছি, ইমাম আহমদ ইবনু হাম্বল রহ. স্পষ্ট ভাষায় শুধু তিনটি হাদিসের তাওয়িল করেছেন : (ক) হাজরে আসওয়াদ পৃথিবীতে আল্লাহর ডান হাত। (খ) মুমিনের অন্তর আল্লাহর আঙ্গুলসমূহ থেকে দুই আঙ্গুলের মধ্যে। (গ) আমি ইয়ামানের দিক থেকে রহমানের শ্বাস পাচ্ছি। [ফায়সালুত তাফরিকাহ : ১/৩৮-৪৩]

এরপর তিনি বিস্তারিতভাবে সেই তাওয়িলগুলোর বিবরণ দেন। ইমাম গাজালি রহ. আশআরি বিধায় ইমাম আহমাদের ওপর মিথ্যাচার করেছেন, বিষয়টি কিন্তু এমন নয়। (ইমাম ইবনু তাইমিয়া রহ.-ই এই অভিযোগ দায়েরের কোশেশ করেছেন) আসারি ইমামদের লেখায়ই এগুলোর বিবরণ উঠে এসেছে। ওপরে এর দৃষ্টান্তও বিগত হয়েছে। ইমাম ইবনু কাসির রহ. লেখেন :

وَرَوَى الْبَيْهَقِيُّ عَنْ الْحَاكِمِ عَنْ أَبِي عَمْرٍو بْنِ السَّمَاءِ عَنْ حَنْبَلٍ أَنَّ ۸۹: ۲۲ جَاءَهُ أَهْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ تَأَوَّلَ قَوْلَ اللَّهِ تَعَالَى: وَجَاءَ رَبُّكَ ثَوَابَهُ. ثُمَّ قَالَ الْبَيْهَقِيُّ: وَهَذَا إِسْنَادٌ لَا غَبَارَ عَلَيْهِ.

দিন যায় দ্বীন বেচে

বায়হাকি রহ. তার সনদে ইমাম আহমদ ইবনু হাম্বল রহ. থেকে বর্ণনা করেন, তিনি আল্লাহ তাআলার বাণী—‘তোমার প্রতিপালক এসেছেন’-কে তাওয়িল করেছেন ‘তার সওয়াব এসেছে’ বলে। এরপর বায়হাকি রহ. বলেছেন, এটি হচ্ছে এমন একটি সনদ, যাতে কোনো ধুলো (দুর্বলতা) নেই। [আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া : ১০/৩৫৪]

ইমাম আহমাদ এই তাওয়িল কেন করলেন? এর জবাবও চলে এসেছে ইমাম ইবনুল জাওযির লেখায়:

، أي جاء أمره22 ما لا بد من تأويله كقوله تعالى "وجاء ربك" الفجر: وقال أحمد بن حنبل: وإنما صرفه إلى ذلك أدلة العقل فإنه لا يجوز عليه الانتقال.

কিছু আয়াত এমন আছে, যেগুলোর তাওয়িল করা ছাড়া কোনো উপায় নেই। যেমন, আল্লাহ তাআলার বাণী—‘তোমার প্রতিপালক এসেছেন’ (ফাজর : ১২) অর্থাৎ ‘তাঁর নির্দেশ এসেছে’। আহমদ ইবনু হাম্বল রহ. বলেন, ‘বিবেকের দলিলসমূহ এটিকে এই তাওয়িলের দিকে ফিরিয়েছে। কারণ, আল্লাহর জন্য স্থানান্তর প্রযোজ্য হয় না।’ [দাফউ শুবাহিত তাশবিহ : ১১০] ইমাম আবু ইয়ালা সূত্রেও ইমাম আহমদ থেকে একই ধরনের তাওয়িল বর্ণিত হয়েছে। [দেখুন—যাদুল মাসির : ১/২২৫]

যুক্তি বা বিবেকের দলিল শব্দ শুনলেই যেসব অক্ষরবাদী চোখ কপালে উঠিয়ে জুঁকুঁকে ফেলেন, তারা কি এখন ইমাম আহমদকেও কালামি বলে গালি দেবেন?

ইমাম বায়হাকি রহ. ‘মানাকিবু আহমাদ’ গ্রন্থে লেখেন। ইমাম আহমদ রহ. বলেন:

احتجوا علي يومئذ يعني يوم نوظر في دار أمير المؤمنين، فقالوا: تجيئ سورة البقرة يوم القيامة وتجيئ سورة تبارك، فقلت لهم: إنما

দিন যায় দ্বীন বেচে

هو الثواب. قال الله تعالى "وجاء ربك" إنما تأتي قدرته، وإنما القرآن أمثال ومواعظ. قال البيهقي: هذا إسناد صحيح لا غبار عليه وفيه دليل على أنه كان لا يعتقد في المجيء الذي ورد به الكتاب و النزول الذي وردت به السنة انتقلا من مكان إلى مكان كمجيئ ذوات الأجسام ونزولها، وإنما هو عبارة عن ظهور آيات وقدرته؛ فإنهم لما زعموا أن القرآن كلام الله وصفة من صفات ذاته لم يجز عليه المجيء والإتيان. فأجابهم أبو عبد الله: إنما يجيئ ثواب قرائته التي يريد إظهارها يومئذ، فعبر عن إظهارها إياها بمجيئه. وهذا الجواب الذي أجابهم به أبو عبد الله لا يهتدي إليه إلا الحذاق من أهل العلم المنزهون عن التشبيه.

আমিরুল মুমিনিনের প্রাসাদে যেদিন বিতর্কে আলিমরা আমার বিরুদ্ধে হুজ্জত দায়ের করেছিল, সেদিন তারা জিজ্ঞেস করেছিল, 'কিয়ামতের দিন সুরা বাকারাহ আসবে। সুরা মুলক আসবে। (এসব হাদিসের অর্থ কী?)' তখন আমি তাদেরকে বললাম, 'এগুলোর সওয়াব আসবে'। আল্লাহ তাআলা বলেছেন, 'তোমার প্রতিপালক এসেছেন'। এর অর্থ হলো, 'তাঁর কুদরত আসবে'। কুরআন হচ্ছে দৃষ্টান্ত ও উপদেশের গ্রন্থ।

বায়হাকি রহ. বলেন, এটি এমন সনদে বর্ণিত, যাতে কোনো ধুলো (দুর্বলতা) নেই। এই বর্ণনায় এ ব্যাপারে দলিল রয়েছে যে, কুরআনে (আল্লাহ তাআলার) যে আসার কথা এবং হাদিসে (তাঁর) যে অবতরণ করার কথা বর্ণিত হয়েছে, এসব ক্ষেত্রে তিনি এই বিশ্বাস লালন করতেন না যে, আল্লাহ তাআলা এক স্থান থেকে অন্য স্থানে গমন করেন, যেমন দেহবিশিষ্ট কোনো সত্তা স্থানান্তরিত হয় ও অবতরণ করে থাকে। বরং এগুলো দ্বারা আল্লাহ তাআলার নিদর্শন ও কুদরত বোঝানো উদ্দেশ্য। কারণ, আলিমরা যখন দাবি তুলল যে, কুরআন যেহেতু আল্লাহর কালাম এবং তাঁর সত্তাগত গুণ, তাই এর ব্যাপারে 'আসা' বা 'আগমন করা' শব্দগুলো তো প্রযোজ্য হয় না। তখন ইমাম আহমদ তাদের জবাব

দিন যায় দ্বীন বেচে

দিলেন যে, (এর অর্থ হচ্ছে,) তা পাঠ করার সওয়াব আসবে, যা আল্লাহ সেদিন প্রকাশ করতে চাইবেন। তিনি তেলাওয়াতের সওয়াব প্রকাশ করাকে তাঁর নিজের আসা দ্বারা ব্যক্ত করেছেন। ইমাম আহমদ তাদেরকে এই যে জবাবটা দিলেন, সাদৃশ্যবাদ থেকে মুক্ত বিচক্ষণ আলিমরাই একমাত্র এমন আকিদা পোষণ করে।

ইমাম ইবনু কাসির রহ. ইমাম বায়হাকি থেকে ‘আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া’ গ্রন্থেও (প্রাপ্ত) কোনো সমালোচনা ব্যতিরেকে এ বর্ণনাটি উল্লেখ করেছেন। ইমাম ইবনু হাজম জাহেরি রহ.-ও ‘আল-ফিসাল’ গ্রন্থে (১/২৩৫) ইমাম আহমদ রহ. থেকে উক্ত আয়াতের অনুরূপ তাওয়িল উল্লেখ করেছেন।

‘আর-রাদ্দু আলাল জাহমিয়াহ ওয়ায যানাদিকাহ’ গ্রন্থের পাতায় পাতায় ইমাম আহমদের তাওয়িল বর্ণিত হয়েছে। হায়, অক্ষরবাদীরা একবার যদি নিজেদের ইমামের কিতাব খুলে দেখত, তাহলে এত বড় জালিয়াতি করতে কিছুটা হলেও তাদের বুক কাঁপত। উক্ত গ্রন্থ থেকে ইমাম আহমদের আরও কিছু তাওয়িল লক্ষ করুন—

قالوا: إنه حين قال: {أَلَمْ تَرَ إِلَى رَبِّكَ} أَنَّهُمْ لَمْ يَرَوْا رَبَّهُمْ، وَلَكِنَّ الْمَعْنَى: أَلَمْ تَرَ إِلَى فَعَلِ رَبِّكَ؟ فَقُلْنَا: إِنْ فَعَلَ اللَّهُ لَمْ يَزَلِ الْعِبَادَ يَرُونَهُ.

তিনি যখন আয়াত পাঠ করলেন, ‘তুমি কি তোমার প্রতিপালকের দিকে লক্ষ করোনি?’ (ফুরকান : ৪৫),

তখন তারা বলে উঠল, তারা তাদের প্রতিপালককে দেখেনি। কিন্তু এর অর্থ তো হলো, ‘তুমি কি তোমার রবের কর্মের দিকে লক্ষ করোনি?’ আমরা বলব, নিশ্চয় আল্লাহর কর্মসমূহ মানুষ প্রত্যক্ষ করে। [আর-রাদ্দু আলাল জাহমিয়াহ ওয়ায যানাদিকাহ : ৩৩]

وإنما معنى قول الله جل ثناؤه: {وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ} أَنَّهُ يَرَى مَا نَرَى، وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا نَعْلَمُ.

দিন যায় দ্বীন বেচে

[. يقول: هو إله من في السموات وإله من في الأرض] [الأنعام: رض.

আল্লাহ তাআলার বাণী—‘আর তিনি আল্লাহ আকাশসমূহে ও পৃথিবীতে’ (আনআম : ৩)-এর অর্থ হলো, আল্লাহ বলছেন, তিনি আকাশসমূহে যারা আছে, তাদেরও ইলাহ; পৃথিবীতে যারা আছে, তাদেরও ইলাহ। [প্রাপ্তকৃত : ৩৯]

বলা বাহুল্য, এই তাওয়িলটাও কিন্তু তাওয়িলকে অস্বীকারকারী সকল আসারিও নির্বিশেষে গ্রহণ করে নিয়েছে। যার কারণে তাদের সবাইকেও নির্দিধায় এসকল আয়াতের তাওয়িল করতে দেখা যায়, যেগুলো থেকে ‘আল্লাহ সর্বত্র বিরাজমান’ হওয়ার ধারণা সৃষ্টি হয়। নিজে যা করে, অন্যকে সে কারণে অপরাধী বলা হাস্যকর বৈ কী! ‘আমি করলে আরাম, তুমি করলে হারাম’ তো কোনো ইনসাফের কথা নয়। হায়, তবুও যদি জালিমরা বুঝত!

ইমাম ইবনু কাসির রহ. লেখেন:

وَمِنْ طَرِيقِ أَبِي الْحَسَنِ الْمَيْمُونِيِّ عَنْ أَحْمَدَ أَنَّهُ أَجَابَ الْجَهْمِيَّةَ حِينَ اسْتَحْجَوْا عَلَيْهِ بِقَوْلِهِ تَعَالَى: مَا يَأْتِيهِمْ مِنْ ذِكْرٍ مِنْ رَبِّهِمْ مُخَدَّتٍ إِلَّا . قَالَ: يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ تَنْزِيلُهُ إِلَيْنَا هُوَ 2: 21 اسْتَمْعَوْهُ وَهُمْ يَلْعَبُونَ :الْمُخَدَّتْ، لَا الذِّكْرُ نَفْسُهُ هُوَ الْمُخَدَّتْ. وَعَنْ حَنْبَلٍ عَنْ أَحْمَدَ أَنَّهُ قَالَ يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ ذِكْرَ آخَرَ غَيْرَ الْقُرْآنِ

জাহমিয়ারা যখন এই আয়াত দ্বারা দলিল উপস্থাপন করল যে, ‘তাদের কাছে যখনই তাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে “নতুন উপদেশ” (আয়াত) আসে, তখন তারা কৌতুকচ্ছলে তা শোনে’। [আম্বিয়া : ২] (কুরআন তো নিত্য ও অনাদি, তাহলে একে নতুন ও অনিত্য বলে উল্লেখ করা হলো কেন?) তখন ইমাম আহমদ জবাব দিলেন, হতে পারে এর ব্যাখ্যা হলো, কুরআন আমাদের ওপর নাজিল করার বিষয়টি অনিত্য; মূল কুরআন

দিন যায় দ্বীন বেচে

তো অনিত্য নয়। ইমাম আহমদ থেকে এ-ও বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন, এমনও হতে পারে যে, এর দ্বারা কুরআন ছাড়া অন্য কোনো উপদেশের কথা বোঝানো হয়েছে। [আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া : ১০/৩২৭]

কুরআনে রুহ (আত্মা)-কে আল্লাহর দিকে নিসবত করে ‘রুহুল্লাহ’ বলা হয়েছে। কিন্তু আসারিরা এটাকে আল্লাহর সিফাত সাব্যস্ত করে না। তারা এখানে এসে মুখস্থ বুলি আওড়িয়ে বলে না যে, আল্লাহরও রুহ রয়েছে, তবে তা আমাদের রুহের মতো নয়। ইমাম আহমদ রহ.-ও ‘রুহ’ শব্দের তাওয়িল করতেন। ইমাম আবু ইয়াল্লা রহ. তার থেকে বর্ণনা করেন :

تفسير روح الله إنما معناها: أنها روح خلقها الله تعالى، كما يقال: عبد الله وسماء الله وأرض الله.

আল্লাহর রুহের ব্যাখ্যা হলো, আল্লাহর সৃষ্ট রুহ। যেমন বলা হয়, আল্লাহর বান্দা, আল্লাহর আসমান, আল্লাহর জমিন। [আল-উদ্দাহ ফি উসুলিল ফিকহ : ৩/৭১৩]

এক হাদিসে এসেছে :

القرآن كلام الله: منه بدأ وإليه يعود.

কুরআন আল্লাহর কালাম—তা তার থেকে সূচিত হয়েছে এবং তাঁরই কাছে প্রত্যাবর্তন করবে। [আর-রাদ্দু আলাল জাহমিয়া, দারিমি : ১/১৮৯; সরিহুস সুন্নাহ, তাবারি : ১/১৯; জিয়া মাকদিসি এই হাদিসের ওপর একটি স্বতন্ত্র গ্রন্থই রচনা করেছেন।]

এর বাহ্যিক অর্থ থেকে এই সংশয় সৃষ্ট হয়, তবে কি আল্লাহর সিফাত (কালাম) একবার আল্লাহর থেকে বিযুক্ত হয় এবং পরে আবার তার

দিন যায় দ্বীন বেচে

সঙ্গে গিয়ে মিলিত হয়? এটা তো আল্লাহ তাআলার প্রভুত্বের শানবিরোধী। ইমাম আহমদ রহ. এর তাওয়িল করেন :

منه بدأ علمه وإليه يعود حكمه.

তাঁর থেকে এর ইলম সূচিত হয়েছে এবং তাঁর কাছে এর হুকুম প্রত্যাবর্তন করে। [নিহায়াতুল মুবতাদিয়িন : ২৬]

তার আরও কিছু তাওয়িল লক্ষ্য করুন—

أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الْكَذَّالِيُّ، أَنَّهُ قَالَ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ: «كُلُّ مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ»، مَا تَقْسِيْرُهَا؟ قَالَ: " هِيَ الْفِطْرَةُ الَّتِي فَطَرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ النَّاسَ عَلَيْهِ، شَقِيٌّ أَوْ سَعِيدٌ

কাহহাল বলেন, আমি ইমাম আহমদ রহ.-কে জিজ্ঞেস করলাম, 'প্রত্যেক নবজাতক "ফিতরাতের" ওপর জন্মগ্রহণ করে'। এর কী ব্যাখ্যা? (উল্লেখ্য, কুরআনে 'ফিতরাত' শব্দকে আল্লাহর দিকে নিসবত করে 'ফিতরাতালাহ' বলা হয়েছে।) তিনি বললেন, তা হলো সেই ফিতরাত, যার ওপর তিনি মানুষকে সৃষ্টি করেছেন যে, সে সৌভাগ্যবান নাকি দুর্ভাগ্যবান। [আস-সুন্নাহ, খাল্লাল : ৩/৫৩৫। এছাড়াও অনেক সনদে এটি বর্ণিত হয়েছে।]

أَخْبَرَنِي مَنْصُورُ بْنُ الْوَلِيدِ، قَالَ: ثَنَا عَلِيُّ بْنُ سَعِيدٍ، أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْإِمَامَةِ، مَنْ أَحَقُّ؟ قَالَ: " أَقْرَبُهُمْ، فَإِذَا اسْتَوَوْا فَالْصَّلَاحُ عِنْدِي، وَاللَّهُ أَعْلَمُ، قَدَّمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبَا بَكْرٍ يُصَلِّي بِالنَّاسِ، وَلَمْ يَكُنْ أَقْرَبَهُمْ، وَأَبْنُ مَسْعُودٍ أَعْلَمُهُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ؟ فَقَالَ: هَذَا يَخْتَلِفُ. فَقَالَ: مَنْ شَاءَ؟ قَالَ: إِنَّمَا قَدَمُهُ مِنْ أَجْلِ الْخِلَافَةِ، وَهَذَا مَوْضِعٌ تَأْوِيلُ "

আলি ইবনু সাইদ ইমাম আহমদকে জিজ্ঞেস করলেন, ইমামতির অধিক

দিন যায় দ্বীন বেচে

হকদার কে? তিনি বললেন, সর্বাধিক ভালো কারি (আলিম)। যদি মুসল্লিরা এক্ষেত্রে সমান হয়, তাহলে আমার দৃষ্টিতে—হাকিকত আল্লাহই ভালো জানেন—সততা বিবেচ্য হবে। নবি ﷺ আবু বকর রা.-কে নামাজ পড়ানোর জন্য অগ্রসর করলেন, অথচ তিনি সবার চেয়ে ভালো কারি ছিলেন না; ইবনু মাসউদ রা. ছিলেন আল্লাহর কিতাবের ব্যাপারে সাহাবিদের মধ্যে সর্বাধিক ইলমের অধিকারী।... তিনি আবু বকরকে অগ্রসর করেছেন খিলাফাতের কারণে। এটি তাওয়িলের একটি ক্ষেত্র। [প্রাণ্ডক্ত : ২/৩০২]

عن أبي بكر الأثرم أنه سأل أحمد بن حنبل عن دعاء النبي ﷺ وتعوذه من الفقر، فقال: إنما أراد به فقر القلب.

আসরাম ইমাম আহমদকে জিজ্ঞেস করলেন, রাসুলুল্লাহ ﷺ দারিদ্র্য থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করতেন? তিনি বললেন, এর দ্বারা তিনি অন্তরের দারিদ্র্য উদ্দেশ্য নিয়েছিলেন। [আয-যাইলু আলা তাবাকাতিল হানাবিলা : ১/১১৯]

نقل عنه المروزي في قوله تعالى: وثيابك فطهر. قال: عملك فأصلحه.

আল্লাহ তাআলার বাণী—‘তুমি তোমার কাপড় পবিত্র’ করো। (মুন্দাসসির : ৪) ইমাম আহমদ বলেন, অর্থাৎ তোমার আমল সংশোধন করো। [বাদায়িউল ফাওয়ায়িদ : ৩/৯৫]

তাওয়িল মানেই যদি অস্বীকার হয়, তাহলে ইমাম আহমদও কি কুরআন-সুন্নাহর বিভিন্ন অংশ অস্বীকারকারী ছিলেন? ওপরে যেগুলো উল্লেখ করা হলো, এছাড়াও অসংখ্য তাওয়িল তার থেকে বর্ণিত আছে। উদাহরণস্বরূপ দ্রষ্টব্য—আসসুন্নাহ, খাল্লাল : ১/১৯২; মাসায়িলু ইবনি হানি : ২০১৯; মাসায়িলু আবদিল্লাহ : ১৬১০ প্রভৃতি।

কারও ধারণা হতে পারে, তাহলে বোধ হয় একমাত্র ইমাম আহমদই

দিন যায় দ্বীন বেচে

আশআরি-মাতুরিদিদের দ্বারা প্রভাবিত (?) হয়ে কিছু তাওয়িল করেছেন। অন্যান্য আসারি ইমামগণ বোধ হয় এ থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত। আমরা পরবর্তী পর্বে সর্বযুগের প্রসিদ্ধ বরণ্য আসারি ইমামদের থেকে আল্লাহ তাআলার সিফাত বিষয়ক আয়াত-হাদিসের তাওয়িল উল্লেখ করব ইনশাআল্লাহ। এমনকি ইমাম ইবনু তাইমিয়া রহ., যিনি তাওয়িলের ব্যাপারে বিস্তর নিন্দা ও সমালোচনা করে গেছেন, তার তাওয়িলেরও কিছু নমুনা উপস্থাপন করব। তাওয়িল মাত্রই যদি নিন্দনীয় হয়, তাহলে শুধু আশআরি-মাতুরিদিরাই কেন নিন্দিত হবে? নিন্দার ভাগ সবাইকেই সমানভাবে বইতে হবে।

আশা করি, পাঠক আমাদের সঙ্গে ধৈর্যের পরিচয় দেবেন। আমরা কাউকে আমাদের অন্ধ অনুসরণ করতে বলি না। কিন্তু বিবেক বন্ধক না দিয়ে থাকলে আল্লাহর ওয়াস্তে বিষয়গুলো নিয়ে ভাববেন। আমরা শুধু দলিলের আলোকে আপনাদের বিবেক আকর্ষণ করতে চাই। কোনো ব্যক্তিপূজারী, ধারাপূজারী বা দলপূজারী কিংবা অন্ধদের জন্য আমাদের এসব লেখা নয়। ইসলাম কোনো ব্রাহ্মণ্যবাদ নয় যে, এখানে জালিয়াতি করে হকের সব ঠিকাদারি নির্দিষ্ট কোনো গোষ্ঠী নিয়ে নেবে; আর অন্যরা তা দলিলের আলোকেও যাচাই করে দেখতে পারবে না। বিশেষত যেক্ষেত্রে নামধারী গোষ্ঠী পূর্বসূরিদের আদর্শ থেকে সরে গিয়ে মনগড়া রীতিনীতি উদ্ভাবন করে যুগের পর যুগ সমাজে একচ্ছত্র আধিপত্য চালিয়ে যাবে। নবুওয়াতের দুয়ার বন্ধ; কিন্তু তাজদিদ (সংস্কার)-এর দুয়ার খোলা। ঘুণে ধরা সমাজের প্রতিটি ক্ষেত্রে আজ তাজদিদের বড় প্রয়োজন।

দিন যায় দ্বীন বেচে

শায়খ আবু বকর যাকারিয়া-০৪

ইমাম বুখারি রহ.-এর তাওযিল

রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেন :

يَضْحَكُ اللَّهُ مِنْ رَجُلَيْنِ يَقْتُلُ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ كِلَاهُمَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ

আল্লাহ এমন দুই ব্যক্তিকে দেখে হাসেন, যাদের একজন অপরজনকে হত্যা করে, অনন্তর উভয়ে জান্নাতে প্রবেশ করে। [আস-সুনানুল কুবরা, বায়হাকি : ১৮৫৩২]

ইমাম বায়হাকি রহ. লেখেন :

قَالَ الشَّيْخُ: وَأَمَّا الضَّحْكُ الْمَذْكُورُ فِي الْخَبَرِ فَقَدْ رَوَى الْفَرَزْدِيُّ عَنْ مُحَمَّدَ بْنَ إِسْمَاعِيلَ الْبُخَارِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّهُ قَالَ: «مَعْنَى الضَّحْكِ فِيهِ الرَّحْمَةُ

হাদিসে বর্ণিত ‘হাসা’ শব্দটির ব্যাপারে ইমাম বুখারি রহ. বলেছেন, ‘হাদিসের হাসার অর্থ হচ্ছে রহমত’। [আল-আসমা ওয়াস সিফাত, বায়হাকি : ২/৭৯]

ইমাম বুখারি রহ. তার ‘সহিহ’ গ্রন্থে লেখেন :

: [إِلَّا مُلْكُهُ، وَيَقَالُ: إِلَّا مَا 88{كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ} [القصص: أُرِيدَ بِهِ وَجْهُ اللَّهِ

‘তাঁর চেহারা ব্যতীত সমস্ত কিছুই ধ্বংসশীল’ (কাসাস : ৮৮)-এই আয়াতে ‘তাঁর চেহারা’ অর্থ হলো, ‘তাঁর রাজত্ব’। আরেকটি মত হলো, ‘এমন আমল, যা আল্লাহর সন্তুষ্টির নিমিত্তে করা হয়েছে’। [সহিহ বুখারি, সূরা কাসাসের তাফসির]

দিন যায় দ্বীন বেচে

বঙ্গদেশীয় আসারিরাও আয়াতে উল্লেখিত ‘চেহারা’ দ্বারা সত্তা উদ্দেশ্য নিয়েছে। শায়খ আবদুল হামিদ ফাইযি মাদানি থেকে শায়খ আবু বকর যাকারিয়া—এ ক্ষেত্রে তাওয়িল করতে কেউ ত্রুটি করেনি। শায়খ যাকারিয়া সিফাত অস্বীকারকারী ট্যাগ থেকে পিঠ বাঁচাতে মূলনীতি থেকে সরে গিয়ে একইসঙ্গে শব্দের মূল অর্থ ও রূপক অর্থ উভয়টি গ্রহণ করেছেন! তবে এখানে যে এ দ্বারা মূলত ‘সত্তা’ উদ্দেশ্য, তা-ও নির্দিধায় স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছেন।

ইমাম তিরমিজি রহ.-এর তাওয়িল

ইমাম তিরমিজি রহ. বর্ণনা করেন:

«وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَوْ أَنَّكُمْ ذَلَّيْتُمْ بِخَبَلٍ إِلَى الْأَرْضِ السَّقْلَى ثُمَّ قَرَأَ {هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ} وَهُوَ لَهَبِطَ عَلَى اللَّهِ» وَقَسَرَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ هَذَا الْحَدِيثَ، [...] بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ {الحديد: علمُ الله وَقَدَرَتُهُ فَقَالُوا: إِنَّمَا هَبِطَ عَلَى عِلْمِ اللَّهِ وَقَدَرَتِهِ وَسُلْطَانِهِ وَسُلْطَانُهُ فِي كُلِّ مَكَانٍ.

রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেন, ‘সেই সত্তার শপথ যাঁর হাতে মুহাম্মাদের জীবন! তোমরা যদি একটি রশি নিম্নতম ভূমির দিকে ছেড়ে দাও, তাহলে তা আল্লাহ তাআলা পর্যন্ত গিয়ে পৌঁছাবে। তারপর তিনি এ আয়াত তিলাওয়াত করেন : তিনিই প্রথম, তিনিই সর্বশেষ, তিনিই প্রকাশ্য এবং তিনিই গুপ্ত। তিনিই সর্ববিষয়ে সর্বশেষ পরিজ্ঞাত।... কিছু আলিম এই হাদিসের ব্যাখ্যা করে বলেন, ‘অর্থাৎ উক্ত রশি আল্লাহ তাআলার জ্ঞান, কুদরত ও তাঁর কর্তৃত্বাধীন স্থানে গিয়ে পৌঁছাবে। আল্লাহ তাআলার জ্ঞান, তাঁর নিদর্শনাবলী ও তাঁর সার্বভৌম ক্ষমতা সর্বত্র বিস্তৃত।’ [সুনানুত তিরমিজি : ৩২৯৮] তিনি অন্যত্র বর্ণনা করেন :

يَأْتِي الْقُرْآنُ وَأَهْلُهُ الَّذِينَ يَغْمَلُونَ بِهِ فِي الدُّنْيَا تَقْدُمُهُ سُورَةُ الْبَقَرَةِ

দিন যায় দ্বীন বেচে

وَأَلْ عَمْرَان... وَمَعْنَى هَذَا الْحَدِيثِ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنَّهُ يَجِيءُ ثَوَابُ قِرَاءَتِهِ، كَذَا فَسَّرَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ هَذَا الْحَدِيثَ وَمَا يُشَبِّهُ هَذَا مِنَ الْأَحَادِيثِ أَنَّهُ يَجِيءُ ثَوَابُ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ. وَفِي حَدِيثِ الثَّوَّاسِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا يَذَلُّ عَلَى مَا فَسَّرُوا إِذْ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «وَأَهْلُهُ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ بِهِ فِي الدُّنْيَا» فَفِي هَذَا دَلَالَةٌ. " أَنَّهُ يَجِيءُ ثَوَابُ الْعَمَلِ.

রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেন, 'কিয়ামতের দিবসে কুরআন ও কুরআনের ধারক-বাহকগণ—যারা দুনিয়াতে তদনুযায়ী আমল করবে, এমনভাবে উপস্থিত হবে যে, সুরা বাকারাহ ও আলে ইমরান তাদের আগে আগে থাকবে।' আলিমগণের দৃষ্টিতে এ হাদিসের অর্থ এই যে, কিয়ামতের দিবসে উক্ত সুরা দুটোর সওয়াব এসে হাজির হবে। একদল আলিম এই হাদিস এবং এ ধরনের বক্তব্য-সংবলিত অন্যান্য হাদিসের ব্যাখ্যায় এ কথাই বলেছেন। নাওয়াস ইবনু সামআন রা. বর্ণিত হাদিসে নবি ﷺ বলেছেন, 'কুরআন এবং যারা দুনিয়াতে কুরআনের ওপর আমল করত, তারা হাজির হবে' এ বাক্য দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, আমলের সওয়াবই হাজির হবে। [সুনানুত তিরমিজি : ২৮৮৩]

ইবনু বাত্তা রহ.-এর তাওয়িল

فَأَمَّا قَوْلُهُ: {وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ}، فَهُوَ كَمَا قَالَ الْعُلَمَاءُ: عِلْمُهُ

আল্লাহর বাণী—‘তোমরা যেখানেই থাকো, তিনি তোমাদের সঙ্গে আছেন’, আলিমগণ বলেছেন যে, এর অর্থ হলো, ‘তাঁর ইলম’ (তোমাদের সঙ্গে আছে)। [আল-ইবানাতুল কুবরা : ৭/১৪৩]

ثُمَّ إِنَّ الْجَهَنَّمَ لَجَاءَتْ إِلَى الْمَغَالِطَةِ فِي أَحَادِيثِ تَأْوِلُهَا مَوْهُوَا بِهَا عَلَى مَنْ لَا يَعْرِفُ الْحَدِيثَ، مِثْلُ الْحَدِيثِ الَّذِي رُوِيَ: " يَجِيءُ الْقُرْآنُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي صُورَةِ الرَّجُلِ الشَّاحِبِ فَيَقُولُ لَهُ الْقُرْآنُ: أَنَا الَّذِي

দিন যায় দ্বীন বেচে

أُظْمَأَتْ نَهَارَكَ وَأَسْهَرْتَ لَيْلَكَ فَيَأْتِي اللَّهُ فَيَقُولُ: أَيُّ رَبِّ تَلَانِي وَوَعَانِي وَعَمَلِي بِي " وَالْحَدِيثُ الْآخَرُ: «تَجِيءُ الْبَقْرَةُ وَأَلْ عَمْرَانُ كَأْتَهُمَا غَمَامَتَانِ»، فَأَخْطَأُ فِي تَأْوِيلِهِ، وَإِنَّمَا عَنَى فِي هَذِهِ الْأَحَادِيثِ فِي قَوْلِهِ: يَجِيءُ الْقُرْآنُ وَتَجِيءُ الْبَقْرَةُ وَتَجِيءُ الصَّلَاةُ وَيَجِيءُ الصِّيَامُ، يَجِيءُ ثَوَابُ ذَلِكَ كُلِّهِ، وَكُلُّ هَذَا مُبَيَّنٌ فِي الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ.

অর্থাৎ, ‘কিয়ামতের দিন কুরআন আসবে’... ‘সূরা বাকারাহ ও আলে ইমরান আসবে’-এর অর্থ হলো, এগুলোর সওয়াব আসবে। কুরআন-সুন্নাহয় এ সবই সুস্পষ্ট রয়েছে। [প্রাণ্ডক্ত : ৬/১৯৩]

وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «كُلُّ مَعْرُوفٍ صَدَقَةٌ»، فَإِنْ شَاكَ الصَّالَةَ صَدَقَةً، وَتَحِيَّتَكَ لِأَخِيكَ بِالسَّلَامِ صَدَقَةٌ، وَأَنْ تَلْقَى أَخَاكَ بِوَجْهِهِ، مُنَبِّسُ صَدَقَةٍ، وَأَمْرُكَ بِالْمَعْرُوفِ صَدَقَةٌ، وَنَهْيُكَ عَنِ الْمُنْكَرِ صَدَقَةٌ وَمُبَاضَعَتُكَ لِأَهْلِكَ صَدَقَةٌ، فَكَيْفَ يَكُونُ الْإِنْسَانُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي ظِلِّ مُبَاضَعَتِهِ لِأَهْلِهِ؟ إِنَّمَا عَنَى بِذَلِكَ كُلِّهِ ثَوَابُ صَدَقَتِهِ، أَلَيْسَ قَدْ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَظِلَّهُ اللَّهُ تَعَالَى فِي ظِلِّ عَرْشِهِ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ، فَلْيَنْظُرْ مَغْسِرًا أَوْ لِيَدْعُ لَهُ»، فَأَعْلَمَكَ أَنَّ الظِّلَّ مِنْ ثَوَابِ الْأَعْمَالِ.

অর্থাৎ, আমলের ‘ছায়া’র অর্থ হলো, আমলের সওয়াব। [প্রাণ্ডক্ত]

وَمَنْ أَصْلَ الْجَهْمِيَّةِ وَمَذَاهِبُهَا أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَحِلُّ فِي الْأَشْيَاءِ كُلِّهَا وَفِي الْأُمُكِنَةِ وَالْأُمُكِنَةِ مَخْلُوقَةٌ، فَلَمَّا عَلِمَ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى هُوَ الْخَالِقُ لَا مَخْلُوقٌ، وَكَذَلِكَ كُلُّ مَا كَانَ مِنْهُ لَا يَكُونُ مَخْلُوقًا قَالَ {وَسِعَ كُرْسِيُّهُ [فَسَرَّهَا ابْنُ عَبَّاسٍ: عَلِمَهُ، فَأَخْبَرَ 255 السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ] الْبَقْرَةُ: أَنَّ عَلِمَهُ وَسِعَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ

জাহমিয়াদের একটি মূলনীতি ও মাযহাব হলো এই আকিদা পোষণ করা

দিন যায় দ্বীন বেচে

যে, আল্লাহ তাআলা সব জিনিসের মধ্যে এবং সব জায়গায় অবতারণিত হন। অথচ সকল জায়গা সৃষ্ট। যখন জানলেন, আল্লাহ তাআলা হচ্ছেন স্রষ্টা; সৃষ্ট নয়। একইভাবে তাঁর সবকিছুই অসৃষ্ট। তখন তিনি বললেন যে, ‘তাঁর কুরসি আকাশসমূহ ও পৃথিবীকে পরিব্যাপ্ত করে রেখেছে’ (বাকারাহ : ২৫৫) আবদুল্লাহ ইবনু আব্বাস রা. এর ব্যাখ্যা করেছেন, কুরসি অর্থ হলো ‘তাঁর ইলম’। আল্লাহ জানালেন যে, তাঁর ইলম আকাশসমূহ ও পৃথিবীকে পরিব্যাপ্ত করে রেখেছে। [প্রাণ্ডক্ত]

ইমাম আজুররি রহ.-এর তাওয়িল

وَقَوْلُهُ عَزَّ وَجَلَّ: {وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَهُ وَفِي الْأَرْضِ إِلَهُ} [الزخرف : ٨٤] فَمَعْنَاهُ: أَنَّهُ جَلَّ ذِكْرُهُ إِلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ , وَإِلَهُ مَنْ فِي الْأَرْضِ , إِلَهُ يُعْبَدُ فِي السَّمَاوَاتِ , وَإِلَهُ يُعْبَدُ فِي الْأَرْضِ , هَكَذَا فَسَرَهُ الْعُلَمَاءُ

আল্লাহর বাণী—‘তিনি সেই সত্তা, যিনি আকাশেও ইলাহ, পৃথিবীতেও ইলাহ’ (জুখরুফ : ৮৪) এর অর্থ হলো, আল্লাহ তাআলা আকাশবাসীর ইলাহ, পৃথিবীবাসীরও ইলাহ। তিনি এমন ইলাহ, আকাশসমূহে যার ইবাদত হয়, পৃথিবীতেও যার ইবাদত হয়। [আশ-শারিয়াহ : ৬৭৭]

ইমাম যাজজাজ হাম্বলি রহ.-এর তাওয়িল

যাজজাজ রহ. ইমাম আহমদের এতটাই অনুরক্ত ছিলেন যে, তিনি দুয়া করতেন, ‘হে আল্লাহ, আপনি আমাকে ইমাম আহমদ ইবনু হাম্বলের মাযহাবের অনুসারী অবস্থায় হাশর করান।’ [মু’জামুল উদাবা : ১/১৩০] তিনি তার তাফসিরে অনেক আয়াতের তাওয়িল করেছেন। অথচ কিতাবে তিনি নিজেই বলে দিয়েছেন, ‘এই গ্রন্থে আমাদের বর্ণিত অধিকাংশ তাফসির ইমাম আহমদ ইবনু হাম্বলের তাফসির হতে গৃহীত।’ [মাআনিল কুরআন : ৪/১৬৬] তার কিছু তাওয়িলের নমুনা:

দিন যায় দ্বীন বেচে

ومعنى: (وَمَا تَنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ). هذا خاص للمؤمنين، أعلمهم أنه قد علم أنهم يريدون بنفقتهم ما عند الله جلّ وعزّ، لأنه إذا أعلمهم ذلك فقد علموا أنهم مثابون عليه، كما قال: (وَمَا تَنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُؤَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَظْلَمُونَ).

‘তোমরা তো শুধু আল্লাহর চেহারা চেয়েই ব্যয় করে থাকো’ (বাকারাহ : ২৭২)। এটি মুমিনদের সঙ্গে বিশেষিত। আল্লাহ তাদেরকে অবগত করলেন যে, তিনি জানেন, তারা তাদের দানের দ্বারা আল্লাহর নিকট যা রয়েছে শুধু তা-ই চেয়ে থাকে। কারণ, তিনি যখন তাদেরক বিষয়টি জানালেন, তখন তারা এই ইলম লাভ করল যে, তারা এর বিনিময়ে প্রতিদানপ্রাপ্ত হবে। যেমন, আল্লাহ বলেন, ‘তোমরা উত্তম কিছু ব্যয় করলে তার পুরস্কার তোমাদেরকে পুরোপুরিভাবেই দেওয়া হবে এবং তোমাদের প্রতি জুলুম করা হবে না’ (প্রাণ্ডক্ত : ১/৩০২)

শায়খ আবু বকর যাকারিয়াও এই আয়াতের তাওয়িল করে বলেন, ‘এ আয়াতে ব্যবহৃত “ওয়াজহুল্লাহ” অর্থ আল্লাহর চেহারা; কিন্তু এখানে এ শব্দ দ্বারা তাঁর পূর্ণ সত্তাকেই বোঝানো হয়েছে।’

এছাড়াও যাজজাজ রহ. ‘তোমার রবের চেহারা ব্যতীত সমস্ত কিছুই ধ্বংসশীল’ (কাসাস : ৮৮) এবং ‘তোমার রবের চেহারা বাকি থাকবে’ (রহমান – ২৭) এর তাওয়িল করেন, ‘অর্থাৎ, তোমার রব বাকি থাকবেন এবং তিনি ছাড়া সবকিছু ধ্বংসশীল’। [প্রাণ্ডক্ত : ১/৩২৮]

‘একমাত্র সমুন্নত রবের চেহারার উদ্দেশ্যে’ (আ’লা : ১৯)-এর তাওয়িল করেন, ‘অর্থাৎ, একমাত্র তাঁর সওয়াবের অন্বেষণে’। [প্রাণ্ডক্ত : ৫/২৫৭]

‘আমার চোখের সামনে ও আমার ওহি অনুযায়ী’ (হুদ : ৩৭)-এর তাওয়িল করেন, ‘আমি আপনাকে যা দেখাই এবং আপনার জন্য যে সুরক্ষার ব্যবস্থা করি, তা অবলম্বনে’। [প্রাণ্ডক্ত : ৩/২২৯] **শায়খ**

দিন যায় দীন বেচে

যাকারিয়া এর তাওয়িল করেন, ‘আপনি আমাদের চাক্ষুষ তত্ত্বাবধানে’।

‘তারা কি শুধু এর প্রতীক্ষায় রয়েছে যে, আল্লাহ ও ফেরেশতারা মেঘের ছায়ায় তাদের কাছে উপস্থিত হবেন?’ (বাকারাহ : ২১০)-এর তাওয়িল করেন, ‘ভাষাতত্ত্ববিদরা বলেছেন, আল্লাহ তাঁর ওয়াদাকৃত শাস্তি ও হিসাব উপস্থিত করবেন’। যেমন এই আয়াত—‘আল্লাহ তাদের নিকট এমনভাবে আসলেন যে, তারা কল্পনাও করতে পারেনি’-এর অর্থ হলো, তিনি তাদের লাঞ্ছনা হাজির করলেন। [প্রাগুক্ত : ১/২৪১]

তাঁর আকিদার স্বচ্ছতা এবং নামধারী সালাফিদের সঙ্গে এর পার্থক্য লক্ষ করুন। তিনি বলছেন :

فالله تعالى عال على خلقه وهو على عليهم بقدرته ولا يجب أن يذهب بالعلو ارتفاع مكان إذ قد بينا أن ذلك لا يجوز في صفاته تقدرست

আল্লাহ তাআলা তাঁর সৃষ্টির ওপর সমুন্নত। তিনি তাদের ওপর তাঁর কুদরত দ্বারা সুউচ্চ। এই সমুন্নতি দ্বারা স্থানিক সমুন্নতি উদ্দেশ্য হওয়া আবশ্যিক হয় না। কারণ আমরা সুস্পষ্ট করেছি যে, এটি আল্লাহ তাআলার গুণাবলির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। তিনি পবিত্র। [তাফসিরু আসমায়েল্লাহিল হুসনা : ৪৮]

والله تعالى عال على كل شيء وليس المراد بالعلو ارتفاع المحل لأن الله تعالى يجل عن المحل والمكان وإنما العلو علو الشأن وارتفاع السلطان

আল্লাহ তাআলা সব কিছুর ওপর সমুন্নত। সমুন্নতি দ্বারা স্থানের সমুন্নতি উদ্দেশ্য নয়। কারণ, আল্লাহ তাআলা স্থান ও জায়গা থেকে মুক্ত। সমুন্নতি দ্বারা শুধু মর্যাদার সমুন্নতি এবং কর্তৃত্বের উচ্চতা উদ্দেশ্য। [প্রাগুক্ত : ৬০]

দিন যায় দ্বীন বেচে

আরও কিছু তাওয়িলের উদাহরণ

ইবনু আবি শায়বা রহ. ‘তিনি তোমাদের সঙ্গে আছেন’-এর তাওয়িল করেছেন, অর্থাৎ তাঁর ইলম তোমাদের সঙ্গে আছে। [আল-উলু, যাহাবি : ১৯৮]

ইমাম সা‘ল্যাব রহ. ‘আল্লাহ আকাশসমূহ ও পৃথিবীর নুর’ (নুর : ৩৫)-এর তাওয়িল করেন, ‘অর্থাৎ, আকাশবাসী ও পৃথিবীবাসীর হক’। [আল-আসমা ওয়াস সিফাত, বায়হাকি : ২/১১১]

ইমাম দারিমি রহ. ‘আল্লাহর পার্শ্ব’ (যুমার : ৫৬)-এর তাওয়িল করেন, ‘আল্লাহর সত্তা’। [রাব্দুদ দারিমি আলাল মুরাইসি : ২/৮০৭] তিনি একজন আসারি ইমাম হয়েও আল্লাহর জন্য ‘পার্শ্ব’ সাব্যস্ত করেননি। তবে এই যুগের অনেক নামধারী সালাফি আল্লাহর জন্য ‘পার্শ্ব’ সাব্যস্ত করে এবং শেষে মুখস্থ বুলি আওড়ায় যে, ‘তবে তা আমাদের পার্শ্বের মতো নয়।’

ইবনু খুযায়মা আল্লাহর ‘সুরত’র তাওয়িল করেছেন। [দ্রষ্টব্য—কিতাবুত তাওহিদ : ৫৯] উল্লেখ্য, এর তাওয়িল ইমাম আহমদ থেকেও বর্ণিত হয়েছে।

বাযযার রহ. আল্লাহর ‘দ্রুত ছুটে আসা’ (هرولة)র তাওয়িল করেছেন, ‘অর্থাৎ, আমি তা গ্রহণ করব।’ [আল-বাহরুয যাখখার : ৭১২৯] একই গ্রন্থে তিনি ‘কিয়ামতের দিন সুরা বাকারাহ ও আলে ইমরান আসবে’-এর তাওয়িল করেছেন, ‘অর্থাৎ, তার সওয়াব আসবে’। ‘কিয়ামতের দিন মুমিনের ছায়া হবে তার সদকা’—এই হাদিসের তাওয়িল করেছেন, ‘অর্থাৎ এ সবকিছু আমলের সওয়াব অর্থে প্রযোজ্য হবে’।

ইমাম ইবনু কুতায়বা রহ.-ও রহমানের শ্বাস (نفس الرحمن), দ্রুত ছুটে আসা (هرولة) এবং বিস্মিত হওয়া (عجب)-এর তাওয়িল করেছেন।

দিন যায় দ্বীন বেচে

[দ্রষ্টব্য—তাওয়িল মুখতালিফিল হাদিস : ২১২]

তিনি স্পষ্টভাবে এ কথাও বলেছেন যে, ‘এগুলো সব উপমা ও সাদৃশ্য’।
হায়, এ যুগের নব্য আসারিরা এই আসারি ইমামকে পেলে তাকেও
রূপক ও আলঙ্কারিক অর্থ গ্রহণ করার কারণে সিফাত অস্বীকারকারী
সাব্যস্ত করত এবং ভিডিও বিবৃতি দিয়ে আহলুস সুন্নাহ থেকে খারিজ
করে দিত।

ইবনু আবদিল বার রহ. ‘আল্লাহ ডান হাতে গ্রহণ করবেন’ এই হাদিসের
তাওয়িল করেন, ‘এটি রূপক ব্যবহার। আল্লাহ সদকা কবুল করবেন, এ
কথাটিকে উত্তম উপস্থাপনায় বলা উদ্দেশ্য। আল্লাহ নেওয়ার অর্থ হলো,
তিনি কবুল করা। কোনো কিছু তাঁর সদৃশ নয়। কোনো কিছু তার
অনুরূপ নয়।’ [আল-ইসতিযকার : ৮/৫৯৬]

ইবনু আবি হাতিম হাম্বলি রহ. ‘পায়ের গোছা’ এবং ‘কুরসি’র তাওয়িল
করেন। [তাফসিরু ইবনি আবি হাতিম : ১২/৩২৭]

ইমাম আবু উমর জাহিদ হাম্বলি রহ. ‘পায়ের গোছা’, ‘যাতে আমার
চোখে নৌযান নির্মিত হয়’ এবং ‘আল্লাহর পার্শ্ব’র তাওয়িল করেছেন।
[দ্রষ্টব্য—যাদুল মাসির : ৮/৩৪১; আল-আসমা ওয়াস সিফাত,
বায়হাকি : ২/১৮৭; ইয়াকুতাতুস সিরাত : ৩৪৬, ৪৪৭]

ইমাম আবু বকর ইবনুল আয্হারি উপর্যুক্ত দ্বিতীয় আয়াতটির তাওয়িল
করেছেন। [দ্রষ্টব্য—যাদুল মাসির : ৫/২৮৪]

ইমাম ইবনু মানদাহ রহ. ‘পায়ের গোছা’ ও ‘চেহারা’র তাওয়িল
করেছেন। [দ্রষ্টব্য—আর-রাদু আলাল জাহমিয়াহ : ১৫]

ইমাম ইবনু আকিল রহ. ‘পায়ের গোছা’, ‘চোখ’, ‘বিস্মিত হওয়া’ ও
‘হাসা’ ইত্যাদিকে তাওয়িল করেছেন। ইমাম ইবনুল জাওযি রহ. তার

দিন যায় দ্বীন বেচে

থেকে দাফউ গুবাহিত তাশবিহ গ্রন্থে সেগুলো উল্লেখ করেছেন।

ইমাম সামিরি হাম্বলি রহ.-ও সিফাত-বিষয়ক কিছু হাদিসের তাওয়িল করতেন। [দ্রষ্টব্য—আল-মানহাজুল আহমাদ : ২/৩৫৪]

ইমাম রুসগি হাম্বলি রহ. ‘পায়ের গোছা’, ‘হাত’ এবং ‘পার্শ্ব’কে তাওয়িল করতেন। [দ্রষ্টব্য—রুমুযুল কুনুয : ৮/২৩৯; ৬/৩৬১, ৫১৭; ৪/৫০৬]

ইমাম ইবনুয যাগুনি রহ. তার ‘আর-রাদু আলান নাসারা’ গ্রন্থেও বেশ কিছু তাওয়িল করেছেন। ইমাম ইবনুল জাওযি ‘যাদুল মাসির’ গ্রন্থে অসংখ্য তাওয়িল করেছেন। ইমাম ইবনু রজব হাম্বলি রহ. ‘আল্লাহর ডান হাত’কে তাওয়িল করেছেন। (আয-যাইলু আলা তাবাকাতিল হানাবিলা : ১/১৫৮) ইমাম ইবনু হিশাম আনসারি রহ. ‘আল্লাহর আসা’কে তাওয়িল করেছেন। (আওজাহুল মাসালিক : ৩/১৬৯)

ইমাম ইবনু কাসির রহ. ‘আল্লাহর হাত’ ও ‘চোখে’র তাওয়িল করেছেন। [তাফসিরু ইবনি কাসির : ১/৪৫৯; ৪/২২৫; ২/৫৪১] ইমাম ইবনু আদিল হাম্বলি রহ.-ও তাওয়িল করেছেন। [আল-লুবাব : ৭/৪২৮]

এমনকি ইমাম ইবনু তাইমিয়া রহ. তাওয়িলের বিরুদ্ধে এত কঠোরতা করা সত্ত্বেও নিজস্ব কোনো মূলনীতি উল্লেখ করা ব্যতিরেকে তিনিও তাওয়িল করেছেন। যেমন : তিনি ‘আল্লাহর চেহারা বাকি থাকবে’—এর তাওয়িল করেছেন, ‘তাঁর সত্তা বাকি থাকবে’। (মাজমুউল ফাতাওয়া : ২/৪৩৪) ‘তোমরা যে দিকেই ফিরবে, সে দিকেই আল্লাহর চেহারা রয়েছে’—এর তাওয়িল করেছেন, সে দিকেই আল্লাহর কিবলা ও দিক। (প্রাগুক্ত : ২/৪২৯; ৬/১৬) তিনি ‘পায়ের গোছা’রও তাওয়িল করেছেন। (প্রাগুক্ত : ৬/৩৯৫) তারচে আরও মজার বিষয় হলো, তিনি ইমাম ইবনু বাত্তা, ইবনু মানদা ও আজুররি রহ.-কে খাঁটি হাম্বলি ও সহিহ আহলুল হাদিসের ধারার অনুসারী বলে আখ্যায়িত করেছেন। ওপরে আমরা কিন্তু তাদের তাওয়িলও উল্লেখ করেছি। এত কিছু পরও তাওয়িল

দিন যায় দ্বীন বেচে

ভাষ্টি? তাওয়িল ভ্রষ্টতা? তাওয়িল নিন্দনীয়? বড় আজিব এক যুগে আমাদের বসবাস।

এখন বাকি রইল তাদের দ্বিতীয় অভিযোগ। পরবর্তী পর্বে আমরা তা নিয়ে আলোচনা করব ইনশাআল্লাহ।

শায়খ আবু বকর যাকারিয়া-০৫

শায়খত্রয় আশআরি-মাতুরিদিদেরকে ভ্রান্ত, আহলুস সুন্নাহ থেকে খারিজ এবং কিছু সিফাত অস্বীকারকারী প্রমাণ করার জন্য দ্বিতীয় যে দলিল দেন তা নিম্নরূপ :

তারা নাম ও সিফাত সম্পর্কিত কুরআন ও হাদিসের বক্তব্যগুলোকে আল্লাহর প্রতি সমর্পণ করে এবং বলে যে, এগুলো দ্বারা কি উদ্দেশ্য আল্লাহই ভালো জানেন, আমাদের বোধগম্য নয়। আর এ আকীদা তারা পোষণ করে যে, এ নাম এবং গুণাবলী সম্পর্কে কুরআন ও হাদিসের বক্তব্যসমূহ দ্বারা প্রকাশ্য অর্থ বুঝানো হয় নি।

এর টীকায় শায়খ আবু বকর যাকারিয়া লেখেন :

পূর্বেই বলা হয়েছে যে, এটি সঠিক পদ্ধতি নয়, এটি ভুল বিশ্বাস। কারণ, আল্লাহ তা'আলার কুরআন ও রাসূলের সুন্নাহ কোনো ধাঁধা গ্রন্থ নয় যে, এখানে এমন কিছু থাকবে যে, তার প্রকাশ্য অর্থ করা যাবে না, আর তার অর্থ বুঝা যাবে না।

মূল আলোচনায় যাওয়ার আগে আমরা তাদের আলোচনার দুটো পয়েন্টের ওপর বিশেষভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করছি :

১. আল্লাহ তা'আলার কুরআন ও রাসূলের সুন্নাহ কোনো ধাঁধা গ্রন্থ নয় যে, এখানে এমন কিছু থাকবে যে, তার প্রকাশ্য অর্থ করা যাবে না, আর

দিন যায় দ্বীন বেচে

তার অর্থ বুঝা যাবে না।

শায়খ যাকারিয়ার এই কথা থেকে বাহ্যত মনে হয়, পুরো কুরআনই বুঝি ‘মুহকাম’ (দ্ব্যর্থহীন); তাতে ‘মুতাশাবিহ’ (দ্ব্যর্থবোধক) বলতে কিছু নেই। কারণ, তার ভাষায় মুতাশাবিহ থাকলে তা ধাঁধাগ্রন্থ হয়ে যায়। অথচ আল্লাহ তাআলা বলেন:

هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ
مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ
الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ
 يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا وَمَا يَذْكُرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ

তিনি সেই সত্তা, যিনি তোমার প্রতি কিতাব নাজিল করেছেন; যার কিছু আয়াত মুহকাম, যার ওপর কিতাবের মূল ভিত্তি এবং অপর কিছু আয়াত মুতাশাবিহ। যাদের অন্তরে বক্রতা আছে, তারা সেই মুতাশাবিহ আয়াতসমূহের পেছনে পড়ে থাকে, উদ্দেশ্য ফিতনা সৃষ্টি করা এবং সেসব আয়াতের ব্যাখ্যা খোঁজা; অথচ সেসব আয়াতের যথার্থ মর্ম আল্লাহ ছাড়া কেউ জানে না। আর যাদের জ্ঞান পরিপক্ব তারা বলে, আমরা এর (সেই মর্মের) প্রতি বিশ্বাস রাখি, (যা আল্লাহ তাআলার জানা)। সবকিছুই আমাদের প্রতিপালকের পক্ষ হতে এবং উপদেশ কেবল তারাই গ্রহণ করে, যারা বুদ্ধিমান। [সূরা আলে ইমরান : ৭]

কুরআনে অনেকগুলো সুরার শুরুতে পৃথক পৃথক হরফ নাজিল করা হয়েছে, যেগুলোকে ‘হরুফে মুকাত্তাআত’ বলা হয়। যেমন : আলিফ-লাম-মিম, সোয়াদ, কাফ, তোয়াহা, ইয়াসিন, হা-মিম প্রভৃতি। গোটা পৃথিবীর কারও পক্ষেই এসব আয়াতের অর্থ করা বা বোঝা সম্ভব নয়। ৬২৩৬ আয়াতের মধ্যে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ এমন আয়াতের অর্থ করা বা বোঝা অসম্ভব হওয়ার কারণে এখন কি কুরআনকে ধাঁধাগ্রন্থ বলা হবে? কুরআন আল্লাহ নাজিল করেছিলেন হিদায়াতের জন্য। এসব

দিন যায় দ্বীন বেচে

আয়াতের অর্থ অবোধগম্য হওয়ার কারণে এখন কি বান্দা হিদায়াত থেকে বঞ্চিত হয়ে যাবে? অথচ বাস্তবতা হলো, এজাতীয় মুতাশাবিহ আয়াতগুলো আল্লাহ নাজিল করেছেন বান্দাকে পরীক্ষা করার জন্য। বান্দা বুঝুক বা না বুঝুক, আল্লাহর ওপর ইমানের ভিত্তিতে সে তাঁর সামনে নির্দিষ্ট আত্মসমর্পণ করতে পারে কি না, এটা যাচাই করার উদ্দেশ্যে। সুতরাং কোনো আয়াতের অর্থ অবোধগম্য হওয়াই এটা প্রমাণ করে না যে, কুরআন ধাঁধাগ্রন্থসদৃশ হয়ে গেছে। এজাতীয় মন্তব্য করা মূর্খতার শামিল।

তাছাড়া অর্থ আল্লাহর ইলমে সমর্পণ করার দ্বারা যদি এমনটি অপরিহার্য হয়, তাহলে শ্রেফ নামকাওয়াস্তে অর্থ সাব্যস্ত করে তার মর্ম আল্লাহর ইলমে সমর্পণ করার ক্ষেত্রেও একই আপত্তি তোলা যায়। কারণ, যখন 'ইয়াদ' শব্দের অর্থ হাত বলে সাথে এ কথাও বলে দেওয়া হবে যে, হাত বলতে আমরা যা বুঝি, এটা আসলে তা নয়; বরং ভিন্ন কিছু। এই হাতের প্রকৃতি, ধরন ও মর্ম আমাদের অবোধগম্য। আল্লাহ ছাড়া কেউ এর স্বরূপ জানে না। এ কথার ওপর কেউ যদি আপত্তি করে, এ আবার কেমন মন্ত্র যে, এর অর্থ করা হবে, কিন্তু কিছু বোঝা যাবে না। তাহলে এ অর্থ করার তাৎপর্য কী থাকছে!

২. তারা নাম ও সিফাত সম্পর্কিত কুরআন ও হাদিসের বক্তব্যগুলোকে আল্লাহর প্রতি সমর্পণ করে এবং বলে যে, এগুলো দ্বারা কি উদ্দেশ্য আল্লাহই ভালো জানেন।

এটাকে আমরা ইচ্ছাকৃত মিথ্যাচার বলতে পারি। কারণ, তাফউইদের অর্থ কখনোই এটা নয় যে, সিফাত সম্পর্কিত সকল আয়াত ও হাদিসের বক্তব্যই আল্লাহর ইলমের প্রতি সমর্পণ করা হবে। সিফাত সম্পর্কিত আয়াত ও হাদিস তো অসংখ্য। এর কয়টির জ্ঞান আল্লাহর ইলমে ন্যস্ত করা হয়? নব্য আসারিদের অধিকাংশজনকেই আমি দেখেছি, তারা তাফউইদের ক্ষেত্রেই জানে না। যার কারণে মনগড়া অপবাদ আরোপ

দিন যায় দ্বীন বেচে

করতে থাকে। যেমন, পূর্বে তাওয়িলের আলোচনায় আমরা দেখিয়েছি যে, এরা ঢালাওভাবে তাওয়িলের বিরোধিতা করতে থাকে। অথচ কিছু তাওয়িল এতটাই জরুরি যে, কেউ যদি তা না করে, সে কাফির হয়ে যাবে।

কোনো অক্ষরবাদী যদি কিছু আয়াত ও হাদিস পাঠ করে এভাবে বুলি আওড়াতে শুরু করে যে, ‘আল্লাহ ভুলে যান, তবে আমাদের ভুলে যাওয়ার মতো নয়। আল্লাহ কষ্ট পান, তবে আমাদের কষ্ট পাওয়ার মতো নয়। আল্লাহ অসুস্থ হন, তবে আমাদের অসুস্থ হওয়ার মতো নয়। আল্লাহ ক্ষুধার্ত ও পিপাসার্ত হন, তবে আমাদের ক্ষুধা ও পিপাসার মতো নয়। আল্লাহ বান্দার কাছে খাবার ও পানি চান, তবে তা আমাদের চাওয়ার মতো নয় ইত্যাদি।’ তবে এই ব্যক্তির ব্যাপারে ফাতওয়া কী হবে? অক্ষরবাদ সবক্ষেত্রে প্রযোজ্য হলে তো এ কথাও বৈধ হবে যে, আত্মা আল্লাহর একটি গুণ। তাঁরও আত্মা (রুহ) আছে, তবে আমাদের আত্মার মতো নয়। তাফউইদ হলো তিন জিনিসের নাম :

১.কুরআন ও হাদিস আল্লাহ তাআলার যে সকল নাম ও গুণের কথা বলেছে, নির্বিশেষে তা সবই সাব্যস্ত করা।

২.যে সকল সিফাত আল্লাহ তাআলার জন্য ‘তাশবিহ’ (সৃষ্টির সঙ্গে সাদৃশ্য)-এর সংশয় সৃষ্টি করে, সেগুলোর ‘হাকিকত’ (স্বরূপ) আল্লাহ তাআলার ইলমের দিকে ন্যস্ত করা।

৩.এমন সব বাহ্যিক অর্থ নাকচ করা, যা তাশবিহ (সাদৃশ্য)-এর সংশয় সৃষ্টি করে।উদাহরণস্বরূপ,যে সব অর্থ অঙ্গের সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ হওয়ার সংশয় সৃষ্টি করে অথবা যে সব অর্থ আল্লাহ তাআলা অনিত্য,অনাদি, অবিনশ্বর ও পরিবর্তনশীল,হওয়ার সংশয় সৃষ্টি করে,সেগুলো নাকচ করা।

এবার মূল আলোচনায় আসি।

দিন যায় দ্বীন বেচে

তাফউইদ?

প্রথমে তাফউইদের সংজ্ঞা জেনে নেওয়া দরকার। তাফউইদ হলো—

رد المعنى القطعي لآيات الصفات التي يفهم منها التجسيم والتشبيه إلى الله تعالى مع الاعتقاد بأنه ليس كمثل شئ

‘কোনো কিছুই আল্লাহর অনুরূপ নয়’—এই আকিদা রেখে সিফাতের যে সকল আয়াত থেকে দেহ বা সাদৃশ্য বোঝা যায়, সেগুলোর অকাট্য অর্থ আল্লাহ তাআলার দিকে ন্যস্ত করা। [আল-কাওলুত তামাম : ৮০]

তাফউইদের সংজ্ঞা থেকে জানা গেল : (ক) সিফাতের সকল আয়াত ও হাদিসের ক্ষেত্রে তাফউইদ করা হয় না। (খ) তাফউইদের আগে ‘তানযিহ’ (তথা কোনো কিছুই আল্লাহর অনুরূপ নয়) সাব্যস্ত করা জরুরি। (গ) সিফাতের যে সকল আয়াত ও হাদিস দেহ ও সাদৃশ্যের সংশয় সৃষ্টি করে, শুধু সেগুলোর ক্ষেত্রে তাফউইদ প্রযোজ্য। (ঘ) এসকল ক্ষেত্রে সংশয় সৃষ্টিকারী শব্দের সুনিশ্চিত ও অকাট্য অর্থ আল্লাহর ইলমে ন্যস্ত করা হবে এবং নিজেদের পক্ষ থেকে প্রকৃত বা রূপক কোনো অর্থ নির্ধারণ করা হবে না।

ইমাম নববি রহ. লেখেন :

اعلم أن لأهل العلم في أحاديث الصفات وآيات الصفات قولين أحدهما وهو مذهب معظم السلف أو كلهم أنه لا يتكلم في معناها بل يقولون يجب علينا أن نؤمن بها ونعتقد لها معنى يليق بجلال الله تعالى وعظمته مع اعتقادنا الجازم أن الله تعالى ليس كمثل شئ وأنه منزّه عن التجسيم والانتقال والتحيز في جهة وعن سائر صفات المخلوق وهذا القول هو مذهب جماعة من المتكلمين واختاره جماعة من محققهم وهو أسلم

দিন যায় দ্বীন বেচে

জেনে রাখো, সিফাতের আয়াত এবং হাদিসসমূহের ক্ষেত্রে আলিমগণের দু'ধরনের অভিমত রয়েছে :

ক. অধিকাংশ সালাফ, বরং সকল সালাফের মায়হাব হলো, এগুলোর অর্থের ব্যাপারে কিছু বলা হবে না। বরং তারা বলেন যে, 'আমাদের ওপর অপরিহার্য হলো, আমরা এগুলোর প্রতি ইমান রাখব। আমরা এগুলোর এমন অর্থের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করব, যা মহান আল্লাহর বড়ত্ব এবং মাহাত্ম্যের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। পাশাপাশি আমরা দৃঢ়ভাবে এ বিশ্বাস রাখব যে, আল্লাহ তাআলা এমন সত্তা, যার অনুরূপ কিছুই নেই আর তিনি দেহধারণ, স্থানান্তর, কোনো দিকে স্থান গ্রহণ করা এবং মাখলুকের অন্য সকল সিফাত থেকে পবিত্র। মুতাকাল্লিমদের এক জামাআতের মায়হাবও এটা। মুহাক্কিক মুতাকাল্লামিদের এক জামাআত এই মতকেই গ্রহণ করেছে। আর এটাই সবচে' নিরাপদ মায়হাব।...

ইমাম আহমদ রহ. যদিও সাধারণত 'ইসবাত' (অর্থ সাব্যস্ত) করতেন, কিন্তু তার থেকে 'তাফউইদ'র মতও বর্ণিত রয়েছে। এমনিও ইমাম আহমদ রহ.-এর একটা বৈশিষ্ট্য হলো, প্রচুর পরিমাণ মাসআলায় তার থেকে একাধিক মত পাওয়া যায়। তার থেকে তাফউইদের যে মত বর্ণিত রয়েছে, অতীতে যারা সেগুলো উদ্ধৃত করেছেন, তারা সেই বক্তব্য বিকৃত করে মনগড়া ব্যাখ্যা করেননি। কিন্তু এই যুগের নব্য আসারিরা এ কাজেও বেশ পারঙ্গম। কারণ, অঘোষিতভাবে তারা তাওয়িলে বেশ সিদ্ধহস্ত। তারা শুধু কুরআন-হাদিসেই তাওয়িল করে না; মানুষের স্পষ্ট বক্তব্যেও দূরবর্তী তাওয়িলের পসরা সাজায়। ইমাম ইবনু কুদামা রহ. কোনো তাওয়িল ব্যতিরেকে বর্ণনা করেন, ইমাম আহমদ রহ. বাহ্যত সৃষ্টির সঙ্গে স্রষ্টার সাদৃশ্য সৃষ্টি করে এমন কিছু হাদিসের ব্যাপারে বলেন :

দিন যায় দ্বীন বেচে

نُؤْمِنُ بِهَا وَنُصَدِّقُ بِهَا وَلَا كَيْفَ وَلَا مَعْنَى وَلَا نَرُدُّ مِنْهَا شَيْئًا

আমরা এসব হাদিসের প্রতি ইমান রাখব। এগুলোকে সত্যায়ন করব। কোনো ধরন বর্ণনা করব না। কোনো অর্থ করব না। কোনো সিফাতকেই রদ করব না। [যামুত তাওয়িল : ৩৩]

মারওয়াজি রহ.-এর বর্ণনায় এসেছে, তিনি বলেন :

أَحَادِيثُ الصِّفَاتِ تَمَرُ كَمَا جَاءَتْ

সিফাতের হাদিসসমূহ যেভাবে এসেছে, সেভাবেই চালিয়ে দেওয়া হবে।

মৃত্যুর তিন দিন আগেও এক জিজ্ঞাসার জবাবে তিনি অনুরূপ কথা বলেছেন। দেখা যাচ্ছে, তিনি এজাতীয় সিফাতের হাদিসসমূহ যেভাবে এসেছে, সেভাবে পাঠ করে যাওয়ার কথাই বলতেন। তার ভিত্তিতে আল্লাহর জন্য নিত্যনতুন গুণ সাব্যস্ত করতেন না। ইমাম আহমদ রহ. থেকে একটা বিশুদ্ধ বর্ণনাও পাওয়া যায় না, যাতে তিনি বলেছেন যে, আল্লাহর চেহারা আছে, আঙুল আছে, ছায়া আছে, দ্রুত ছুটে চলার গুণ আছে ইত্যাদি। তিনি বলেন :

،وَنَحْنُ نُؤْمِنُ بِالْأَحَادِيثِ فِي هَذَا وَتَقْرُهَا، وَنَمُرُّهَا كَمَا جَاءَتْ بِهَا كَيْفَ وَلَا مَعْنَى إِلَّا عَلَى مَا وَصَفَ بِهِ نَفْسَهُ تَعَالَى، نَسْأَلُ اللَّهَ السَّلَامَةَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الزَّلَلِ، وَالْإِتْيَابِ وَالشُّكْلِ إِنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

আমরা এ বিষয়ক হাদিসসমূহের ওপর ইমান রাখি। এগুলোকে স্বীকার করি। কোনো ধরন নির্ধারণ বা অর্থ করা ব্যতিরেকে যেভাবে এসেছে, সেভাবেই চালিয়ে দিই। তবে তিনি নিজেকে যেসব গুণে গুণাবিত করেছেন, সেগুলোর কথা ভিন্ন। আমরা দুনিয়া ও আখিরাতে আল্লাহর

দিন যায় দ্বীন বেচে

কাছে নিরাপত্তা চাই। আল্লাহর কাছে পদস্বলন, সংশয় ও সন্দেহ থেকে আশ্রয় চাই। নিশ্চয়ই তিনি সর্ববিষয়ে পরিপূর্ণ ক্ষমতাবান। [আল-ইবানাহ, ইবনু বাত্তাহ : ৩/৫৮]

ইমাম ইবনু হামদান রহ. ইমাম আহমদ রহ. থেকে বর্ণনা করেন :

أحاديث الصفات تمر كما جاءت من غير بحث على معانيها، وتخالف ما خطر في خاطر عند سماعها، ونفي التشبيه عن الله تعالى عند ذكرها مع تصديق النبي ﷺ، والإيمان بها. وكلما يعقل ويتصور فهو تكيف وتشبيه، وهو محال.

সিফাতের হাদিসসমূহ যেভাবে এসেছে, তার অর্থ অনুসন্ধান না করে সেভাবেই চালিয়ে দেওয়া হবে। হাদিসগুলো শুনলে অন্তরে যে অর্থ উদ্বেক হয়, তার বিরোধিতা করা হবে। আমরা এসব হাদিস শোনার সময় নবি ﷺ-এর প্রতি সত্যায়ন ও ইমান রেখে আল্লাহ তাআলা থেকে সাদৃশ্য নাকচ করব। যখনই এ হাদিসগুলো বোধগম্য হবে বা কল্পনা করা যাবে, তখন তা হবে ধরন নির্ধারণ ও সাদৃশ্য নিরূপণ। আর তা অসম্ভব। [নিহায়াতুল মুবতাদিয়িন : ৩৫]

আচ্ছা, আপনার কি মনে হয়, উপরিউক্ত সবগুলো উক্তির ক্ষেত্রেই ইমামগণের বর্ণনায় ভুল হয়েছে? তারা অসতর্কতাবশত 'ইসবাত'কে 'তাফউইদ' বলে চালিয়ে দিয়েছেন? আর এর সঙ্গে কোনো টীকাও যোগ করেননি বা কোনো মন্তব্যও জুড়ে দেননি! সব ঠিকাদারি এই যুগের নাম বিকিয়ে খাওয়া আসারিদের জন্য রেখে গিয়েছেন?

ইমাম ইবনু কাসির রহ. লেখেন :

وإنما نسلك في هذا المقام مذهب السلف الصالح مَالِكٌ وَالْأَوْزَاعِيُّ وَالتَّوْرِيُّ وَاللِّثْنِيُّ بْنُ سَعْدٍ وَالتَّشَافِعِيُّ وَأَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ بْنُ رَاهُوِيَهْ وَغَيْرُهُمْ مِنْ أَيْمَةِ الْمُسْلِمِينَ قَدِيمًا وَحَدِيثًا وَهُوَ إِمْرَازُهَا كَمَا جَاءَتْ

দিন যায় দ্বীন বেচে

مَنْ غَيَّرَ تَكْيِيفَهُ وَلَا تَشْبِيهِهُ وَلَا تَغْطِيلَهُ وَالظَّاهِرُ الْمُتَبَادِرُ إِلَى أَذْهَانِ
الْمُشَبَّهِينَ مَنفِيٌّ عَنِ اللَّهِ لَا يَشَبَّهُهُ شَيْءٌ مِنْ خَلْقِهِ وَلَيْسَ كَمَثَلِهِ شَيْءٌ

এক্ষেত্রে আমরা সালাফে সালাহীন—মালিক, আওজায়ি, সুফয়ান সাওরি, লাইস ইবনু সাদ, শাফেয়ি, আহমদ, ইসহাক ইবনু রাহুওয়াহসহ পূর্ববর্তী ও পরবর্তী ইমামগণের মাযহাব গ্রহণ করব। আর তা হচ্ছে, এসকল আয়াত যেভাবে এসেছে, কোনো ধরন নির্ধারণ, সাদৃশ্য নিরূপণ বা অকার্যকর না করে সেভাবেই চালিয়ে দেওয়া হবে। সাদৃশ্যবাদীদের মস্তিষ্কে শব্দ শোনাযাত্রই যে বাহ্যিক অর্থ কল্পনায় আসে, তা আল্লাহর থেকে নাকচকৃত। কোনো সৃষ্টি আল্লাহর সঙ্গে সাদৃশ্য রাখে না। কোনো কিছু তার অনুরূপ নয়। [তাফসিরু ইবনি কাসির : ৩/৩৮৩]

সাদৃশ্যবাদীদের কল্পনায় ‘ইয়াদ’ শব্দ শুনলে কোন অর্থ কল্পনায় আসে? হাত নাকি অন্য কিছু? তো এখানে কোন অর্থ নাকচের কথা বলা হলো? তবে কি এটা শায়খত্রয়ের ভাষায় সিফাত অস্বীকারের নামাস্তর হয়ে গেল?

ইমাম জাহাবি রহ. লেখেন :

من أقر بذلك -أي الاستواء- تصديقا لكتاب الله ولأحاديث رسول الله ﷺ وأمن به مفوضا معناه إلى الله ورسوله ولم يخض في...التأويل ولا عمق فهو المسلم المتبع

যে ব্যক্তি আল্লাহর কিতাব এবং রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর প্রতি সত্যায়নস্বরূপ ‘ইসতিওয়া’ স্বীকার করবে, এর অর্থ আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের দিকে ন্যস্ত করে এর ওপর ইমান রাখবে, তাওয়িলে ডুব দেবে না এবং গভীরতায়ও যাবে না, সে প্রকৃত মুসলিম। [সিয়ার : ১৪/৩৭৪]

فقلونا في ذلك وبابه: الإقرار والإمرار وتفويض معناه إلى قائله.
الصادق المعصوم.

দিন যায় দ্বীন বেচে

এটিসহ এ বিষয়ক অন্যান্য বর্ণনার ব্যাপারে আমাদের কথা হলো, স্বীকার করে নেওয়া, (যেভাবে এসেছে, সেভাবে) চালিয়ে দেওয়া এবং তাঁর অর্থ রাসুলের ওপর ন্যস্ত করা, যিনি সত্যবাদী, নিষ্পাপ। [সিয়ার : ৮/১০৫]

কাজি আবু ইয়ালা রহ.-ও তাফউইদেদের কথা বলেছেন :

، أن الله سبحانه استأثر بعلم حقائق صفاته ومعانيها عن العالمين
وهو التفويض الصحيح عند الحنابلة.

আল্লাহ তাআলা তাঁর সিফাতসমূহের হাকিকত ও অর্থ জগৎবাসীকে না জানিয়ে তার জ্ঞান নিজের কাছে রেখেছেন। হাম্বলিদের নিকট সহিহ তাফউইদ এটাই। [তাবাকাতুল হানাবিলা : ২/২০৭]

ইমাম ইবনু কুদামা রহ. তার আকিদার বর্ণনা দেন :

وما أشكل من ذلك وجب إثباته لفظاً وترك التعرض لمعناه نرد علمه
إلى قائله ونجعل عهديته على ناقله اتباعاً لطريق الراسخين في العلم
الذين أثنى الله عليهم في كتابه المبين.

সুদৃঢ় জ্ঞানের অধিকারী, আল্লাহ তাঁর সুস্পষ্ট কিতাবে যাদের প্রশংসা করেছেন, তাদের ধারা অনুসরণে যেসব সিফাত দ্ব্যর্থবোধক হবে, সেগুলোর শব্দ সাব্যস্ত করা হবে এবং অর্থ ছেড়ে দেওয়া হবে। আমরা এর ইলম কথকের দিকে ন্যস্ত করব। আমরা এই দায়িত্ব আরোপ করব বর্ণনাকারীর ওপর। [লুমআতুল ইতিকাদ : ৪৩]

ইমাম মারঈ কারমি রহ. লেখেন :

إن مذهب السلف هو عدم الخوض في مثل هذا وال سكوت عنه

দিন যায় দ্বীন বেচে

وتفويض علمه إلى الله تعالى.

সালাফের মাযহাব হলো এজাতীয় নুসুসে নিমগ্ন না হওয়া, নীরব থাকা এবং এর ইলম আল্লাহর দিকে ন্যস্ত করা। [আকাওয়িলুস সিকাত : ৬১]

وجمهور أهل السنة، منهم السلف وأهل الحديث على الإيمان بها وتفويض معناها المراد منها إلى الله تعالى، ولا نفسرها مع تنزيهنا له عن حقيقتها.

আহলুস সুন্নাহর সংখ্যাগরিষ্ঠ ইমাম, যাদের মধ্যে সালাফ এবং আহলুল হাদিসরাও রয়েছেন, তাদের মাযহাব হলো, এসব আয়াত-হাদিসের ওপর ইমান আনা হবে এবং এর উদ্দিষ্ট অর্থ আল্লাহ তাআলার ইলমে ন্যস্ত করা হবে। এর মূল অর্থ থেকে আমরা আল্লাহকে পবিত্র ঘোষণা করে এর নির্দিষ্ট কোনো তাফসির করব না। [প্রাগুক্ত : ৬৫]

ইমাম সাফারিনি রহ. থেকেও অনুরূপ তাফউইদের কথা বর্ণিত রয়েছে। [লাওয়ামিউল আনওয়ার : ১/৯৮]

ওপরে যাদের নাম উল্লেখ করা হলো, তারা কেউই কিন্তু আশআরি-মাতুরিদি নন; বরং সবাই আসারি মাযহাবের সবিশেষ উল্লেখযোগ্য বড় বড় ইমাম। এখন তাফউইদের অপরাধে তাদেরকেও সিফাত অস্বীকারকারী বলা হবে? তারচে আরও মজার বিষয় হলো, ইমাম আহমদ রহ. থেকে বিশুদ্ধ সূত্রে বর্ণিত হয়নি যে, তিনি আঙুল বা পায়ের গোছাকে আল্লাহ তাআলার গুণ সাব্যস্ত করেছেন। কিন্তু আজকাল ঠিকই এই কাজ করা হয়। ইমাম ইবনু রজব হাম্বলি রহ. ‘ফাজলু ইলমিস সালাফ’ গ্রন্থে ইমাম আহমদ রহ.-এর পরবর্তী মুহাদ্দিস যারা, তাদের আকিদার ব্যাপারে সতর্ক করেছেন। কারণ, তারা অক্ষরবাদের প্রতি ঝুঁকে পড়েছিল।

অথচ বিস্ময়ের ব্যাপার হলো, কোনো কোনো অক্ষরবাদী আল্লাহ

দিন যায় দ্বীন বেচে

তাআলার জন্য ‘আরশে বসা’র গুণও সাব্যস্ত করে বসেছে। অথচ সিফাত প্রমাণিত হওয়ার জন্য প্রামাণিকতা ও অর্থ নির্দেশ উভয় ক্ষেত্রে অকাট্য, এমন দলিলের প্রয়োজন হয়। কুরআনের কোনো আয়াতে আল্লাহ তাআলার জন্য এই সিফাত সাব্যস্ত করা হয়নি। কোনো সহিহ হাদিসে তাঁর জন্য এই সিফাত সাব্যস্ত করা হয়নি। তদুপরি এটি প্রভুত্বের শানবিরোধী। এ কারণে ইমামুল আসর আল্লামা আনওয়ার শাহ কাশ্মীরি রহ. লেখেন, ‘আল্লাহ আরশের ওপর ইসতিওয়া করার অর্থ যদি এটা বলা হয় যে, তিনি তাতে সমাসীন হয়েছেন, তবে এটি একটি বাতিল কথা। অর্বাচীন বা পথভ্রষ্ট ব্যক্তি ছাড়া অন্য কেউ এই মত পোষণ করতে পারে না।’ ইমাম ইবনুল জাওযি রহ. লেখেন :

إنهم أثبتوا لله تعالى صفات، وصفات الحق لا تثبت إلا بما يثبت به الذات من الأدلة القطعية.

তারা আল্লাহ তাআলার জন্য অনেক গুণ সাব্যস্ত করে ফেলেছে। অথচ আল্লাহ তাআলার গুণ সাব্যস্ত হওয়ার জন্য এমন অকাট্য দলিলের প্রয়োজন, যা দ্বারা সত্তা সাব্যস্ত হতে পারে। [দাফউ শুবাহিত তাশবিহ:৬]

কেউ বলবে, অক্ষরবাদীরাও তো তাদের এই ভ্রান্ত মতের পক্ষে কিছু আক্ষরিক দলিল উপস্থাপন করে। এগুলোর ব্যাপারে কী বলবেন? এক্ষেত্রে আমরা নিজেরা কিছু না বলে ইমাম শাতিবি রহ.-এর উক্তি উল্লেখ করব। এই উক্তিটি সবার অন্তরে গেঁথে নেওয়া দরকার। তাহলে অক্ষরবাদীদের দলিল নামক শুবহা (সংশয়) থেকে বাঁচা সহজ হবে। তিনি বলেন:

وقد علم العلماء أن كل دليل فيه اشتباه وإشكال ليس بدليل في الحقيقة، حتى يتبين معناه ويظهر المراد منه. ويشتط في ذلك أن لا يعارضه أصل قطعي. فإذا لم يظهر معناه لا جمال أو اشتراك أو عارضه قطعي؛ كظهور تشبيهه، فليس بدليل؛ لأن حقيقة الدليل أن

দিন যায় দ্বীন বেচে

يَكُونُ ظَاهِرًا فِي نَفْسِهِ، وَذَالًا عَلَى غَيْرِهِ، وَإِلَّا اخْتِيجَ إِلَى دَلِيلٍ عَلَيْهِ،
فَإِنَّ دَلَّ الدَّلِيلُ عَلَى عَدَمِ صِحَّتِهِ فَأُخْرِى أَنْ لَا يَكُونُ دَلِيلًا.

আলিমরা জানেন, যে দলিলের মধ্যে অস্পষ্টতা বা দ্ব্যর্থবোধকতা থাকে, তা বাস্তবে দলিলই নয়; যতক্ষণ না তার অর্থ সুস্পষ্ট হয় এবং উদ্দেশ্য প্রকাশিত হয়। দলিল হিসেবে বিবেচিত হওয়ার জন্য শর্ত হলো, কোনো অকাট্য মূলনীতি তার সঙ্গে সাংঘর্ষিক হবে না। যখন কোনো অস্পষ্টতা বা দ্ব্যর্থবোধকতার কারণে দলিলের অর্থ স্পষ্ট হবে না বা কোনো অকাট্য মূলনীতি তার সঙ্গে সাংঘর্ষিক হবে—যেমন : (সৃষ্টির সঙ্গে আল্লাহর) সাদৃশ্য প্রকাশ পাচ্ছে, তাহলে তা কোনো দলিলই নয়। কারণ, দলিলের তত্ত্বকথা হলো, তা নিজের ক্ষেত্রেও সুস্পষ্ট হবে অন্যের ওপর নির্দেশ করবে, অন্যথায় এর ওপর আরেক দলিলের প্রয়োজন হবে। দলিল যদি তার অশুদ্ধতা প্রমাণ করে, তাহলে তা দলিল হওয়ারই উপযুক্ত নয়। [আল-ইতিসাম : ১/৩০৪; আল-মুওয়াফাকাত : ৪/৩২৪]

আজকাল কিছু শায়, অস্পষ্ট, দ্ব্যর্থবোধক, দুর্বল এমনকি মুনকার বর্ণনা দ্বারাও আল্লাহ তাআলার জন্য নিত্যনতুন সিফাত সাব্যস্ত করা হয়; যার পক্ষে অকাট্য দলিল নেই, চার ইমামের কোনো ইমামের উক্তিও নেই। আর শেষে একটা মুখস্থ বুলি যোগ করে দিয়েই নিজেদের কার্য সমাধা করে ফেলার অপচেষ্টা চালানো হয় যে, ‘তবে তা আমাদের মতো নয়’। মজার বিষয় হলো, ইমাম আহমদ রহ. ফিকহের ক্ষেত্রেই কিয়াস করতে নিষেধ করেছেন। কিন্তু আজকালকার আসারিরা আকিদার ক্ষেত্রেও কিয়াসের অনুপ্রবেশ ঘটিয়ে বসে। ইমাম আহমদ রহ. বলেন :

يَنْبَغِي لِلْمُتَكَلِّمِ فِي الْفَقْهِ أَنْ يَجْتَنِبَ هَذَيْنِ الْأَصْلَيْنِ: الْمُجْمَلُ وَالْقِيَاسُ.

ফিকহ নিয়ে যে কালাম করবে, তার জন্য সমীচীন হলো সে দুটো উসূল পরিহার করে চলবে—মুজমাল (অস্পষ্ট) এবং কিয়াস। [আল-মুসাওয়াদাহ : ৩৬৮] উল্লেখ্য, এর দ্বারা এমন কিয়াস উদ্দেশ্য, যা

দিন যায় দ্বীন বেচে

নুসুসের সঙ্গে বিরোধপূর্ণ।

আজকাল তো এমন আসারিদেরও দেখা পাওয়া যায়, যারা ‘আল্লাহ শুনবেন’-এর ওপর ভিত্তি করে তাঁর জন্য কান সাব্যস্ত করে বসে; তবে সাথে বলে দেয়, ‘আমরা সেই কানের স্বরূপ ও ধরন জানি না’। একইভাবে ‘আল্লাহ দৃশ্য হবেন’-এর ওপর ভিত্তি করে তাঁকে সাকার সাব্যস্ত করে বসে; তবে সাথে যুক্ত করে দেয়, ‘তবে সেই আকার আমাদের মতো নয়’। নাউজুবিল্লাহ।

শায়খ আবু বকর যাকারিয়া-০৬

শায়খের দেহবাদী আকিদা এবং ইমাম তহাবির ওপর খোলা মিথ্যাচার আমাদের সম্মানিত ইমাম যারা—তাবেয়ি আবু হানিফা, আবু ইউসুফ, মুহাম্মাদ প্রমুখ মনীষীগণের আকিদার সংকলনগ্রন্থের নাম ‘আল-আকিদাতুত তহাবিয়াহ’। প্রতিটি কওমি মাদরাসায় এই গ্রন্থটি পাঠ্যপুস্তকের অন্তর্ভুক্ত। এই গ্রন্থ পাঠ করেই আমাদের আকিদার হাতেখড়ি হয়েছে এবং এর ওপরই আমাদের আকিদার ভিত্তি স্থাপিত হয়েছে। আমরা মনে করি, মুসলমানদের আকিদার পরিশুদ্ধির জন্য এই গ্রন্থটি সবার জন্য অবশ্যপাঠ্য। কিন্তু দুঃখজনক ব্যাপার হলো, আমাদের আসারি ভাইয়েরা এই কিতাবের বক্তব্য বিকৃতি করতে বেশ সিদ্ধহস্ত। শুধু এই কিতাবই নয়, আমাদের আকিদার যত কিতাব রয়েছে—আলফিকহুল আকবার থেকে আল-ইবানাহ, সবগুলোতে তারা জঘন্যভাবে তাদের বিকৃতি ও জালিয়াতির হাত ঢুকিয়েছে। নিজেদের মাসলাক প্রতিষ্ঠা করার জন্য চূড়ান্ত অসততার পরিচয় দিয়েছে। শায়খ আবু বকর যাকারিয়া সাহেবকেও এক্ষেত্রে আমরা ব্যতিক্রম পাইনি। তিনি তার অনুদিত ও সম্পাদিত ‘আল-আকিদাতু তহাবিয়াহ’ গ্রন্থে ৩৮ নম্বর আকিদার ব্যাখ্যায় লেখেন :

দিন যায় দ্বীন বেচে

“আর আল্লাহ তাআলা সীমা পরিধি থেকে উর্ধ্বে এবং অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ও সাজ-সরঞ্জাম থেকে মুক্ত। অন্যান্য সৃষ্ট বস্তুর ন্যায় ষষ্ঠ দিক তাঁকে বেষ্টন করে রাখতে পারে না।” এ কথাটিতে অস্পষ্টতা রয়েছে, আল্লাহর নাম ও গুণাবলীর অপব্যাক্যকারী ও বিকৃতিকারীদের কেউ সে অস্পষ্টতার সুযোগ নিতে পারে। অথচ গ্রন্থকারের এ কথার মধ্যে তাদের মতের সপক্ষে কোনো প্রমাণ নেই। কারণ, উক্ত কথা দ্বারা গ্রন্থকারের উদ্দেশ্য আল্লাহ তা’আলা ওয়া তা’আলাকে সৃষ্টির কারও সাদৃশ্যতা থেকে পবিত্র ঘোষণা করা। তবে তিনি একটি অস্পষ্ট বাক্য নিয়ে এসেছেন যা স্পষ্ট করার প্রয়োজন, যাতে করে সন্দেহ সংশয় দূরীভূত হয়। এখানে গ্রন্থকার ‘সীমা’ বলে বুঝিয়েছেন সে সীমা যা মানুষ জানে। কারণ, মহান আল্লাহর সীমা-পরিসীমা তিনি ব্যতীত কেউ জানে না। যেমন, তিনি সূরা ত্বা-হায় বলেন,

{طه: ১১০} (يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا ۝ ۱۱۰)

“তিনি তাদের সামনে ও পিছনে যা আছে সবই জানেন আর তারা তাঁকে জ্ঞানে আয়ত্ত্ব করতে পারে না”। [সূরা ত্বা-হা, আয়াত: ১১০] সালাফে সালাহীন তথা পূণ্যবান পূর্বসূরীগণের মধ্যে যারা আরশের উপর আরোহণ ইত্যাদি সংক্রান্ত সীমা বর্ণনা করেছেন, সেখানে ‘সীমা’ দ্বারা তাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে এমন সীমা-পরিসীমার কথা যা আল্লাহ তা’আলা জানেন, বান্দার জানা কোনো সীমা নয়।

এখানে শায়খ স্পষ্ট দাবি করলেন যে, আল্লাহ তাআলার সীমা রয়েছে; তবে সেই সীমা মানুষের অজ্ঞাত। এর পক্ষে তিনি একটি আয়াত দ্বারাও দলিল দেওয়ার চেষ্টা করেছেন। আমরা এখন পয়েন্ট আকারে তার এই দাবি এবং দলিলের বিশ্লেষণ করে দেখব।

১. ইমাম তহাবি রহ. স্পষ্টভাবে বললেন, আল্লাহ তাআলা সর্বপ্রকার

দিন যায় দ্বীন বেচে

সীমা-পরিধি থেকে মুক্ত। আর কিতাবের ভূমিকায় তিনি লিখেছেন, এই কিতাবে বর্ণিত আকিদাসমূহ ইমাম আবু হানিফা, আবু ইউসুফ ও মুহাম্মাদ রহ.-সহ সম্মানিত সালাফ ইমামগণের আকিদা। তার এই স্পষ্ট আকিদাকে বিকৃতভাবে উপস্থাপন করার অধিকার শায়খ যাকারিয়া সাহেবকে কে দিলো? যেখানে ইমাম তহাবি বলছেন, আল্লাহ সর্বপ্রকার সীমা-পরিধি থেকে মুক্ত; সেখানে তার কথার এই ব্যাখ্যা দাঁড় করানো যে, আল্লাহর সীমা-পরিধি রয়েছে, তবে তা আমাদের অজ্ঞাত—সুস্পষ্ট মিথ্যাচার ও অপব্যাক্ষ্য বৈ কী! সহিহ আকিদার দাবিদার থেকে আমরা সহিহ আচরণ আশা করি; বিকৃত ও গলদ আচরণ নয়।

২. ইমাম তহাবি রহ.-সহ অন্যরা দেহবাদের খণ্ডন প্রসঙ্গে এই আকিদা তুলে ধরেন। যার কারণে তারা কথাটিকে এতটা ব্যাপকতার সাথে আনেন, যাতে সুযোগসন্ধানীদের জন্য কোনো সুযোগ বাকি না থাকে। ইমাম তহাবি রহ. লেখেন:

تعالى الله عن الحدود والغايات

আল্লাহ তাআলা (স্থান ও কালের) সীমা এবং পরিধি-পরিসীমা থেকে পবিত্র।

তহাবি রহ. এখানে তার ও ইমামগণের আকিদা সুদৃঢ় করার জন্য পাশাপাশি দুটো শব্দ ব্যবহার করলেন, যাতে কেউ এর ভুল অর্থ দাঁড় করাতে না পারে। তাছাড়া উভয় শব্দই বহুবচন, যার শুরুতে আবার রয়েছে ‘আলিফ-লাম লিল ইসতিগরাক’। সুতরাং বাক্যটির যথার্থ অনুবাদ হবে এরূপ—‘তিনি সর্বপ্রকার সীমা ও পরিসীমা থেকে পবিত্র’। অর্থাৎ, তাঁর সত্তার কোনোই সীমা-পরিধি নেই। এমন নয় যে, শুধু আমাদের জ্ঞাত সীমা-পরিধি নেই; বরং জ্ঞাত-অজ্ঞাত কোনো সীমা-অন্ত নেই। কথার ব্যাপকতার দাবিই এটা। আরবি ভাষা সম্বন্ধে যাদের জ্ঞান রয়েছে, তাদের অজানা নয় যে, এরূপ সুস্পষ্ট ও দ্ব্যর্থহীন কথাকে ভিন্ন

দিন যায় দ্বীন বেচে

অর্থে দাঁড় করানো যায় না। যদি কেউ দাঁড় করায়, তবে তা কথার এমন ব্যাখ্যা হবে, যা থেকে কথক পবিত্র। একই আকিদা অন্যান্য ইমামগণের লেখায়ও বিবৃত হয়েছে। যেমন, তার সমসাময়িক ইমাম আবুল হাসান আশআরি রহ. লেখেন :

إن البارئ جل ثناؤه ليس بجسم، ولا محدود، ولا ذي نهاية.

নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআলা দেহবিশিষ্ট নন, সীমাবদ্ধ নন, পরিসীমায়ুক্ত নন। [মাকালাতুল ইসলামিয়্যন : ২০৭]

শুধু তা-ই নয়; ইমাম আবু হানিফা রহ.-এর 'আল-ফিকহুল আকবারে'ই (৫৬-৫৭) এসেছে :

ولا حد له.

তাঁর কোনো সীমাই নেই।

এখানে তিনি (بلا النافية للجنس) আল্লাহ তাআলার সর্বপ্রকার সীমা-পরিধিকেই অস্বীকার করলেন; শুধু জ্ঞাত সীমা-পরিধিই নয়, যেমনটা এই নব্য আসারিরা দাবি করে।

ইমাম মাতুরিদি রহ. লেখেন :

والله يتعالى عن وصف الحد... مع إحالة القول بالحد، فأخبر الله أنه ليس بحدود وجهات.

আল্লাহ তাআলা সীমার গুণ থেকে পবিত্র। তাঁর ব্যাপারে সীমার কথা বলা অসম্ভব। তাই আল্লাহ নিজেই জানিয়ে দিলেন যে, তিনি সীমা ও দিকবিশিষ্ট নন। [কিতাবুত তাওহিদ : ৮১]

উপরিউক্ত বক্তব্যগুলোর মধ্যে আপনি মৌলিক কোনো ভিন্নতা দেখতে পাচ্ছেন কি? আমাদের ইমামগণের আকিদা সর্বযুগেই অভিন্ন ছিল।

দিন যায় দ্বীন বেচে

কিন্তু অপপ্রচারকারীরা তাদের কারও ব্যক্তিত্বকে গলদভাবে উপস্থাপন করেছে আর কারও কথাকে বিকৃত করে চরম জালিয়াতির পরিচয় দিয়েছে। মজার বিষয় হলো, সালাফের সুস্পষ্ট আকিদাকে বিকৃত করে তারাই নাকি রিয়েল সালাফি; আর আমরা তাদের অবিকৃত আকিদা লালন করেও নাকি সালাফের আকিদাধারী হতে পারিনি। যুগে যুগে এভাবেই বুঝি কচকচে রিয়াল ফেইক আকিদাকেও রিয়েল বানিয়ে ছেড়েছে।

৩. ইমামগণ এই আকিদা পেলেন কোথেকে? তারা মূলত এই আয়াত থেকে আকিদাটি গ্রহণ করেছেন—

لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ

কোনো কিছুই তাঁর অনুরূপ নয়। [সূরা শুরা : ১১]

এই আয়াতটি সৃষ্টির সঙ্গে স্রষ্টার সর্বপ্রকার সাদৃশ্যকে নাকচ করেছে। এমন নয় যে, শুধু জ্ঞাত সাদৃশ্য নাকচ করেছে; কিন্তু অজ্ঞাত সাদৃশ্য স্বীকার করে নিয়েছে। কারণ, স্বীকৃত মূলনীতি হলো, النكرة بعد النفي (তফিদ العموم)। প্রয়োজনে দ্রষ্টব্য—ইকমালুল মু'লিম, কাজি ইয়াজ : ২/৪৬৬; কিতাবুত তাওহিদ, মাতুরিদি : ৭৪]

এ কারণেই সর্বযুগের ইমামরা এ আয়াতের দলিল দিয়ে দেহবাদীদের খণ্ডন করেছেন এবং এর ভিত্তিতে আল্লাহ তাআলার দেহ, দিক ও স্থান অস্বীকার করেছেন।

৪. আরশে আরোহণের সীমা আবার কী জিনিস? আল্লাহ কি আরশ সৃষ্টির পরে তাতে আরোহণ করেছেন? আর এর দ্বারা তার সীমা ও স্থান সাব্যস্ত হয়েছে? নাউজুবিল্লাহ। কুরআন-সুন্নাহর বাইরে গিয়ে বিভিন্ন ব্যক্তিত্বের বিচ্ছিন্ন মতামতের তাকলিদ (অন্ধ অনুসরণ) করাই কি নব্য আসারিদের বৈশিষ্ট্য? ইসতিওয়ার অর্থ ইমাম আহমদের উদ্ধৃতিতেই

দিন যায় দ্বীন বেচে

আমরা পূর্বে উল্লেখ করেছি, ‘নিশ্চয়ই মহান আল্লাহ মহিমান্বিত আরশের ওপর সমুন্নত।... ইসতিওয়ার অর্থপ্রসঙ্গে তিনি বলতেন, সমুন্নত হওয়া এবং সুউচ্চ হওয়া। আল্লাহ তাআলা তাঁর আরশ সৃষ্টির পূর্ব থেকেই সুউচ্চ ও সমুন্নত। তিনি সবকিছুর উর্ধ্বে, সবকিছুর ওপরে। আল্লাহ তাআলা আরশকে বিশেষিত করেছেন; কারণ, অন্য সব জিনিসের বিপরীতে তার মধ্যে বিশেষ কিছু রয়েছে। আরশ সর্বোত্তম এবং সর্বোচ্চ জিনিস। এ কারণে আল্লাহ তাআলা নিজের গুণ বর্ণনা করেছেন এ কথা বলে যে, তিনি আরশের ওপর ইসতিওয়া করেছেন, অর্থাৎ তার ওপর সমুন্নত হয়েছেন। এ কথা বলা বৈধ হবে না যে, তিনি স্পর্শ করার দ্বারা বা সম্মুখস্থ হওয়ার দ্বারা সমুন্নত হয়েছেন। আল্লাহ তাআলা এ সবকিছু থেকে অনেক উর্ধ্বে। আল্লাহ তাআলার সঙ্গে কোনো পরিবর্তন ও রূপান্তর সম্পৃক্ত হয় না। আরশ সৃষ্টির পূর্বে এবং আরশ সৃষ্টির পরে কোনো প্রকার সীমা-পরিধি তার সঙ্গে যুক্ত হয়নি।’ { আল-আকিদা, খাল্লাল : ১০৭-১০৮ }

শেষ বাক্যটি আরেকবার পড়ুন। প্রয়োজনে বারবার পড়ুন। এরপর নিরপেক্ষ দৃষ্টিকোণ থেকেই ইমাম আহমদের আকিদা আর বর্তমান নামধারী সালাফিদের আকিদার মধ্যে তুলনা করুন। অনুগ্রহপূর্বক অন্ধত্বের পরিচয় দেবেন না এবং দলপূজা বা শায়খপূজা মাথায় রেখে কথাগুলোর মূল্যায়ন করবেন না। আল্লাহ বলেন, ‘চোখ তো অন্ধ হয় না; কিন্তু বক্ষস্থিত অন্তর অন্ধ হয়ে যায়’।

৫. সহিহ আকিদার দাবিদাররা আল্লাহ তাআলার সীমা-পরিসীমা রয়েছে—এ মর্মে কি একটি আয়াত বা সহিহ হাদিস দেখাতে পারবে? শায়খ যাকারিয়া এখানে যে টীকাটি যুক্ত করেছেন, তা-ও অবশ্য তার নিজস্ব বক্তব্য নয়। তিনি শায়খ বিন বাজ রহ.-এর একটি টীকা হুবহু কপি-পেস্ট করেছেন। শায়খ বিন বাজ রহ.-ও এই কথাগুলো গ্রহণ করেছেন ইমাম ইবনু আবিল ইজ তাইমি রহ. থেকে; যিনি আকিদা

দিন যায় দ্বীন বেচে

তহাবি গ্রন্থকে ইমাম ইবনু তাইমিয়া রহ.-এর মূলনীতির আলোকে নতুন করে সাজিয়েছেন। তাই এতে এমন কিছু ব্যাখ্যাও তিনি সংযুক্ত করে দিয়েছেন, যা ইমাম ইবনু তাইমিয়া রহ.-এর মতাদর্শ হলেও সংখ্যাগরিষ্ঠ হানাফি ইমামদের নিকট অগ্রহণযোগ্য। তাই এ ব্যাখ্যাগ্রন্থের ওপর যুগে যুগে অনেক ইমাম আপত্তি করেছেন। চলমান সিরিজের চতুর্থ পর্বে আমরা এ বিষয়ের ওপর আলোকপাত করেছি। সবচেহা স্যকর ব্যাপার হলো, ইমাম তহাবি রহ. গ্রন্থের শুরুতে লিখেছেন,

هذا ذكر بيان عقيدة أهل السنة والجماعة على مذهب فقهاء الملة.

এখানে তিনি স্পষ্টভাবে উল্লেখ করলেন যে, এ গ্রন্থে আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআতের আকিদার ‘বয়ান’ উল্লেখিত হয়েছে। বয়ান মানে সুস্পষ্ট বিবরণ। কিন্তু এই শায়খরা সুস্পষ্ট বিবরণকে অস্পষ্ট বলে আখ্যায়িত করার অপচেষ্টা চালালেন। হাজার বছর ধরে সাধারণ-অসাধারণ সব মানুষ এই গ্রন্থটি পাঠ করে আসছে। ইমাম তহাবি রহ. নির্বিশেষে সকল মুসলমানের আকিদা পরিশুদ্ধির উদ্দেশ্যে এই গ্রন্থটি প্রণয়ন করেছেন। কীভাবে ভাবা যায়, এতে মৌলিক আকিদার বিবরণে তিনি অস্পষ্টতা রেখে দেবেন! উপরন্তু যখন গ্রন্থের কলেবর সংক্ষিপ্ত হওয়া সত্ত্বেও তিনি তার এ বিষয়ক আকিদা সুস্পষ্ট করার জন্য একটির স্থলে দুটো শব্দ ব্যবহার করেছেন, উভয় শব্দকে ব্যাপক এবং বিস্তৃত করার জন্য ব্যাকরণের নীতি অনুসারে বহুবচন এবং ‘আলিফ লাম লিল ইসতিগরাক’ও এনেছেন। এরপরও তার কথার এমন অপব্যাক্ষা করা জুলুম বৈ কী!

৬. ইমাম তহাবি রহ.-এর এই গ্রন্থে মৌলিক আকিদার সুস্পষ্ট বিবরণ এসেছে বলেই সব ঘরানার সালাফগণ একে বিনা বাক্যব্যয়ে গ্রহণ করে নিয়েছেন এবং এর আলোকে নিজেদের আকিদা সাজিয়েছেন। ইমাম তাজুদ্দীন সুবকি রহ. (মৃত্যু : ৭৭১ হিজরি)-এর উক্তি এক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিক :

দিন যায় দ্বীন বেচে

أنا أعلم أن المالكية كلهم أشاعرة لا أستثنى أحداً والشافعية غالبهم أشاعرة لا أستثنى إلا من لحق منهم بتجسيم أو اعتزال ممن لا يعبا الله به والحنفية أكثرهم أشاعرة أعنى يعتقِدُونَ عقد الأشعرى لا يخرج منهم إلا من لحق منهم بالمعتزلة والحنابلة أكثر فضلاء متقدميهم أشاعرة لم يخرج منهم عن عقيدة الأشعرى إلا من لحق بأهل التجسيم وهم فى هذه الفرقة من الحنابلة أكثر من غيرهم.

আমি জানি, মালিকি মাযহাবের সকল অনুসারী আশআরি। আমি কাউকে এ থেকে বাদ দেবো না। শাফিয়ি মাযহাবের অধিকাংশ অনুসারী আশআরি; এক্ষেত্রে আমি তাদের বাদ দেবো, যারা দেহবাদ বা মুতাজিলি মাযহাবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে—যাদেরকে আল্লাহ কোনো পরোয়া করেন না। হানাফিদের অধিকাংশ আশআরি, অর্থাৎ তারা আশআরিদের মতো আকিদা রাখে (বলা বাহুল্য, আশআরি ও মাতুরিদিদের মধ্যে শাখাগত কিছু মতভিন্নতা ছাড়া মৌলিক পার্থক্য নেই)। এ থেকে শুধু তারাই বাইরে রয়েছে, যারা মুতাজিলাদের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে। পূর্ববর্তী হাম্বলি ইমামদের অধিকাংশজন আশআরি। তাদের মধ্য হতে আশআরির আকিদা থেকে শুধু তারাই বেরিয়ে গেছে, যারা দেহবাদীদের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে। হাম্বলিদের মধ্যে দেহবাদীদের সংখ্যা অন্যদের থেকে অনেক বেশি। [তাবাকাতুশ শাফিয়িয়াতিল কুবরা : ৩/৩৭৭]

শেষ বাক্যটা কয়েকবার পড়ুন। এই কথাটা যদি এই মহান ইমাম না বলে আমরা কেউ বলতাম, তাহলে এর পরিণাম কী হতো? উপরন্তু এটা তার একার মন্তব্য নয়; পরবর্তী পর্বে এর আরও দৃষ্টান্ত আমরা উল্লেখ করব ইনশাআল্লাহ। বাস্তবতা স্বীকার করে নিতে প্রশস্ত অন্তর লাগে; কিন্তু খুব কম মানুষেরই তা থাকে। এরপর তার বক্তব্য লক্ষ করুন :

وهذه المذاهب الأربعة - ولله الحمد- فى العقائد يد واحدة؛ إلا من لحق منها بأهل الاعتزال أو التجسيم، وإلا فجمهورها على الحق،

দিন যায় দ্বীন বেচে

يقرون عقيدة أبي جعفر الطحاوي التي تلقاها العلماء سلفا وخلفا بـ
القبول، ويدينون لله برأي شيخ السنة أبي الحسن الأشعري الذي لم
يعارضه إلا مبتدع.

এই চার মাযহাব আলহামদুলিল্লাহ আকিদার ব্যাপারে ঐক্যবদ্ধ। তবে তাদের মধ্যে যারা মুতাজিলা বা দেহবাদীদের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে, তাদের কথা ভিন্ন। অন্যথায় সংখ্যাগরিষ্ঠরাই হকের ওপর রয়েছে। তারা ইমাম আবু জাফর তহাবি রহ.-এর আকিদা স্বীকার করে নেয়, পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সকল আলিম যা গ্রহণ করে নিয়েছে। আর তারা আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআতের ইমাম আবুল হাসান আশআরি রহ.-এর মতানুসারে দীনের আকিদা গ্রহণ করে; যার বিরোধিতা একমাত্র বিদআতিরাই করতে পারে। [মুঈদ্দুন নিআম : ২২]

ইমাম আবু মানসুর বাগদাদি রহ. (মৃত্যু : ৪২৯ হিজরি) লেখেন :

وأما جسمية خراسان، فتكفيرهم واجب؛ لقولهم بأن لله حد ونهاية
من جهة السفلى، ومنها يماس العرش.

খোরাসানের দেহবাদীদের তাকফির করা ওয়াজিব। কারণ তারা বলে, আল্লাহ তাআলার সীমা-পরিধি রয়েছে নিচের দিক থেকে। আর এ থেকেই তিনি আরশ স্পর্শ করেন। [উসুলুদ দীন : ৩৩৭]

বলা বাহুল্য, সালাফ বলতে যদি শুধু বিশেষ ঘরানার নির্দিষ্ট কয়েকজন ব্যক্তিত্বকে আঁকড়ে ধরেন; তাহলে কস্মিনকালেও প্রকৃত সালাফি হতে পারবেন না। পারবেন শুধু প্রান্তিকতাবাদী হতে। আমরা আলহামদুলিল্লাহ সংখ্যাগরিষ্ঠ সালাফের আদর্শকেই সর্বদা ধারণ করি এবং এটাকেই হিদায়াতের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকার সহজ উপায় মনে করি। কিন্তু দুঃখজনক ব্যাপার হলো, আপনাদের ‘সালাফি’ নামটাই জনসাধারণের বিভ্রান্তির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। তারা আদৌ বুঝতেই পারে না যে, বর্তমান সালাফি আকিদা সবক্ষেত্রে সালাফের আকিদা নয়; বরং

দিন যায় দ্বীন বেচে

কিছুক্ষেত্রে তা সালাফের স্পষ্ট বিরোধিতা।

শায়খ আবু বকর যাকারিয়া-০৭

৭. আল্লাহ তাআলার সীমা-পরিধির ব্যাপারে আমরা সম্মানিত ইমামগণের বক্তব্য উদ্ধৃত করছি; যাতে পাঠকদের সামনে স্পষ্ট হয়ে যায় যে, আল্লাহর সীমা-পরিধির ব্যাপারে সালাফদের আকিদা বাস্তবে কী এবং তাদের নামে প্রচারিত হচ্ছে কী। প্রথমই আমরা ইমাম আহমদ রহ.-এর উদ্ধৃতি উল্লেখ করছি; যেহেতু তার মাযহাবের নামেই এগুলো বাজারজাত করা হচ্ছে।

ইমাম আহমদ রহ. বলেন :

وَلَا تَلْحَقْهُ الْحُدُودُ قَبْلَ خَلْقِ الْغَرَضِ وَلَا بَعْدَ خَلْقِ الْغَرَضِ

আরশ সৃষ্টির পূর্বে এবং আরশ সৃষ্টির পরে কোনো প্রকার সীমা-পরিধি তাঁর সঙ্গে যুক্ত হয়নি। { আল-আকিদা, খাল্লাল : ১০৭-১০৮}

وَسُئِلَ قَبْلَ مَوْتِهِ بَيَوْمٍ عَنْ أَحَادِيثِ الصِّفَاتِ، فَقَالَ... وَلَا يُوصَفُ بِأَكْثَرِ مِمَّا وَصَفَ بِهِ نَفْسَهُ بَلَا حَدٍ وَلَا غَايَةٍ: لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، وَمَنْ تَكَلَّمَ فِي مَعْنَاهَا ابْتَدَعَ

মৃত্যুর একদিন আগে তাকে সিফাতের হাদিসসমূহ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলো। তিনি বললেন, ...আল্লাহ নিজেকে সীমা-পরিধি ব্যতিরেকে যেসব গুণে গুণান্বিত করেছেন, তাকে এরচে বেশি কোনো গুণে গুণান্বিত করা যাবে না। তাঁর অনুরূপ কোনো কিছুই নেই। তিনিই সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা। যে ব্যক্তি এসব হাদিসের অর্থ নিয়ে কথা বলবে, সে বিদআতি কাজ করল। [ইতিকাদুল ইমামিল মুবাজ্জাল : ৮৭; বায়ানু তালবিসিল জাহমিয়াহ : ১/৪৩১]

দিন যায় দ্বীন বেচে

একই ধরনের কথা ইমাম আহমদ থেকে ইমাম ইবনু কুদামাও তার লুমআতুল ইতিকাদে (পৃ. ৪৫) উল্লেখ করেছেন।

وربنا على العرش بلا حد ولا كيف.

আমাদের রব আরশের উর্ধ্বে সীমা-পরিধি ছাড়া এবং ধরন ছাড়া।
[ইতিকাদু আহলিস সুন্নাহ : ৩/৪০২]

أَمْضِ الْحَدِيثَ بِلا كيف ولا حد.

হাদিসটি কোনো ধরন ছাড়া ও কোনো সীমা-পরিধি ছাড়া কার্যকর করো। [প্রাগুক্ত : ৩/৪৫৩]

نحن نؤمن أن الله تعالى على العرش استوى كيف شاء وكما يشاء بـ
بلا حد... وهو كما وصفه، لا تدركه الأبصار بحد ولا غاية.

আমরা বিশ্বাস করি, আল্লাহ তাআলা আরশের ওপর কোনো সীমা-পরিধি ছাড়া ইসতিওয়া করেছেন—যেভাবে চেয়েছেন এবং যেমন চেয়েছেন। তিনি নিজের যে গুণ বর্ণনা করেছেন, তিনি তেমন। দৃষ্টি তাকে সীমা-পরিধি দ্বারা পরিব্যাপ্ত করতে পারে না। [ইজতিমাউল জুয়ুশ : ১/৮২]

وهو على العرش بلا حد... وهو سميع بصير بلا حد ولا تقدير، لا
نتعدى القرآن والحديث، تعالى الله عما يقول الجهمية والمشبهة.

তিনি কোনো সীমা-পরিধি ছাড়া আরশের উর্ধ্বে। তিনি কোনো সীমা-পরিধি ও অনুমান ব্যতিরেকে সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা। আমরা কুরআন ও হাদিসের বক্তব্য অতিক্রম করব না। জাহমিয়া ও মুশাববিহারা যা কিছু বলে, তা থেকে আল্লাহ উর্ধ্বে। [প্রাগুক্ত : ১/১৩২]

হায়, তিনি কি জানতেন যে, একদিন তার নাম বিকিয়েই কিছু মানুষ

দিন যায় দ্বীন বেচে

আল্লাহর জন্য সীমা-পরিধি সাব্যস্ত করে বসবে। তারা কুরআন-হাদিসের বক্তব্য অতিক্রম করে নিজেদের পক্ষ থেকে আল্লাহর জন্য বিভিন্ন নিত্যনতুন গুণ সাব্যস্ত করে বসবে। এসব সাদৃশ্যবাদীদের জুলুম এখানেই শেষ নয়; তারা ইমাম আহমদের নামে সীমা-পরিধি সাব্যস্তকরণের নিসবত চালানোর মানসে দুয়েকটা জাল বর্ণনাও বাজারজাত করেছে। আল্লাহ তাদেরকে হিদায়াত দান করুন। ইমাম আহমদের অনুসরণে তার মাযহাবের প্রথম সারির মনীষীগণও স্পষ্টভাবে আল্লাহ তাআলার সীমা-পরিধি নাকচ করেছেন। এক্ষেত্রে ইবনু বাত্তা, ইবনু শাহিন, আবু ইয়া'লা, ইবনু আকিল, ইবনুল জাওযি, ইবনু হামদান, সাফারিনি ও মাওয়াহিবি প্রমুখের নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। হ্যাঁ, সেসব বিচ্ছিন্নতাবাদী ও প্রান্তিকতাবাদীদের কথা ভিন্ন, যারা সীমা-পরিধি সাব্যস্তকরণের গলদ মানসে স্বতন্ত্র পুস্তিকাও রচনা করে বসেছে। আল্লাহ তাদেরকে ক্ষমা করুন।

এছাড়াও ইমাম বায়হাকি 'মানাকিবু আহমাদ' গ্রন্থে ইমাম আহমদের উক্তি উল্লেখ করেন :

فلم يجز أن يسمى جسماً؛ لخروجه عن معنى الجسمية، ولم يجز في الشريعة.

আল্লাহকে দেহ বলে আখ্যায়িত করা জাযিয় নেই। কারণ, তিনি দেহত্বের বৈশিষ্ট্য থেকে উর্ধ্বে। আর শরিয়তেও এ শব্দ বিবৃত হয়নি।

বলা বাহুল্য, সীমা-পরিধি দেহের বৈশিষ্ট্য। আর আল্লাহ দেহের সর্বপ্রকার বৈশিষ্ট্য থেকে মুক্ত। এ জন্যই তার ব্যাপারে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, স্থান, দিক, আয়তন, গঠন, আকার ইত্যাদি শব্দ প্রযোজ্য হয় না। আর শরিয়তেও তার ব্যাপারে এসব শব্দ বিবৃত হয়নি। কিন্তু কুরআন-হাদিসে আল্লাহ তাআলার ব্যাপারে 'সীমা-পরিধি' শব্দ না আসলেও এ যুগের নব্য আসারিরা তা প্রয়োগ করে থাকে। ইমাম তাজুদ্দীন সুবকি রহ. বড়

দিন যায় দ্বীন বেচে

সুন্দর বলেছেন :

فَهَذِهِ عَقِيدَتُهُمْ وَيُرُونَ أَنَّهُمُ الْمُسْلِمُونَ وَأَنَّهُمْ أَهْلُ السَّنَةِ وَلَوْ عَدُوا
عَدَا لَمَا بَلَغَ عِلْمَاؤُهُمْ وَلَا عَالَمٌ فِيهِمْ عَلَى الْحَقِيقَةِ مَبْلَغًا يَعْتَبَرُ
وَيَكْفُرُونَ غَالِبَ عُلَمَاءِ الْأُمَّةِ ثُمَّ يَعْتَزُونَ إِلَى الْإِمَامِ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَهُوَ مِنْهُمْ بَرٌّ وَلَكِنَّهُ كَمَا قَالَ بَعْضُ الْعَارِفِينَ وَرَأَيْتَهُ
يَخْطُ الشَّيْخَ تَقَى الدِّينَ ابْنَ الصَّلَاحِ إِمَامَانِ ابْتَلَاهُمَا اللَّهُ بِأَصْحَابِهِمَا
وَهُمَا بَرِيَانٌ مِنْهُمْ أَحْمَدُ ابْنُ حَنْبَلٍ ابْتُلِيَ بِالْمُجَسِّمَةِ وَجَعْفَرُ الصَّادِقُ
ابْتُلِيَ بِالرَّافِضَةِ.

...এই হলো দেহবাদীদের আকিদা; অথচ তারা মনে করে, তারা নাকি মুসলিম এবং তারাই আহলুস সুন্নাহ! যদি তাদের সংখ্যা গণনা করা হয়, তাহলে তাদের আলিমরা উল্লেখযোগ্য পরিমাণ হবে না। আর বাস্তবতা হলো, তাদের মধ্যে কোনো প্রকৃত আলিমই নেই। অথচ তারা উম্মাহর সংখ্যাগরিষ্ঠ আলিমদের তাকফির করে; এরপর আবার নিজেদেরকে ইমাম আহমদ ইবনু হাম্বল রহ.-এর দিকে সম্পর্কিত করে। অথচ তিনি তাদের থেকে পবিত্র। জনৈক বুজুর্গ বলেছেন, কথাটা আমি ইমাম তাকিউদ্দীন ইবনুস সালাহ রহ.-এর লেখায় দেখেছি—‘দুজন ইমামকে আল্লাহ তাদের অনুসারীদের দ্বারা পরীক্ষায় ফেলেছেন, অথচ তারা এদের থেকে পবিত্র। একজন হলেন আহমদ ইবনু হাম্বল; যিনি দেহবাদীদের দ্বারা আক্রান্ত হয়েছেন। আরেকজন হচ্ছেন জাফর সাদিক; যিনি রাফেজিদের দ্বারা আক্রান্ত হয়েছেন।’ [তাবাকাতুশ শাফিয়িয়াতিল কুবরা : ২/১৭]

ইমাম ইবনু শাহিন রহ. থেকে অনুরূপ উক্তি ইমাম ইবনু আসাকির রহ. তার ‘তাবয়িনু কাযিবিল মুফতারি’ (পৃ. ১৬৩) গ্রন্থেও উল্লেখ করেছেন।

সুলতানুল উলামা ইজ্জুদ্দীন ইবনু আবদিস সালাম (মৃত্যু : ৬৬০ হিজরি)

দিন যায় দ্বীন বেচে

রহ. বড় বাস্তবসম্মত কথা লিখেছেন। তার প্রতিটি বাক্যকে এই যুগের সঙ্গে মিলিয়ে নিতে পারেন। তিনি লেখেন :

ومذهب السلف إنما هو التوحيد والتنزيه، دون التجسيم والتشبيه
ولذلك جميع المبتدعة يزعمون أنهم على مذهب السلف، فهو كما قال
"قائل: "وكل يدعي وصال ليلى + وليلى لا تقر لهم بذاك"

ومن أنكر المنكرات التجسيم والتشبيه، ومن أفضل المعروف
التوحيد والتنزيه... ولم تزل هذه الطائفة المبتدعة (يعني جهلة
الحنابلة من الحشوية) قد ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا، كلما
أوقدوا نارًا للحزب أطفأها الله، لا تلوح لهم فرصة إلا طاروا
عليها، ولا فتنة إلا أكبوا عليها، وأحمد بن حنبل وفضلاء أصحابه
وسائر علماء السلف براء إلى الله مما نسبوه إليهم واختلقوا عليهم.

সালাফের মাযহাব হলো তাওহিদ এবং (সৃষ্টির সাদৃশ্য থেকে) মুক্ত ঘোষণা; দেহবাদ ও সাদৃশ্যবাদ নয়। এ জন্যই সকল বিদআতি দাবি করে, তারা সালাফের মাযহাবের ওপর রয়েছে। অবস্থাটা কবির সেই কবিতার মতো, 'সকলে লায়লার মিলনের দাবি করে; অথচ লায়লা তাদের জন্য মিলন স্বীকার করে না'। সবচে বড় মুনকার (গর্হিত কাজ) হলো, দেহবাদ ও সাদৃশ্যবাদ আর সবচে শ্রেষ্ঠ মারুফ (উত্তম কাজ) হলো তাওহিদ ও (সৃষ্টির সাদৃশ্য থেকে) মুক্ত ঘোষণা।

এই বিদআতি গোষ্ঠীটি (অর্থাৎ একদল মূর্খ 'হাশাওয়ি' আসারি)-এর ওপর লাঞ্ছনা চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে, তারা যেখানেই থাকুক না কেন। তারা যখনই যুদ্ধের আগুন জ্বালিয়েছে, আল্লাহ তা নিভিয়ে দিয়েছেন। তাদের সামনে কোনো সুযোগ আসলেই তারা সেটার উদ্দেশে ঝাঁপিয়ে পড়ে। কোনো ফিতনা দেখলেই সে দিকে ঝুঁকে পড়ে। ইমাম আহমদ ইবনু হাম্বল রহ. ও তার বিদগ্ধ সঙ্গী এবং সকল সালাফ উলামার দিকে তারা যা কিছু নিসবত করে ও তাদের নামে যা কিছু রটনা করে, তারা

দিন যায় দ্বীন বেচে

আল্লাহর নিকট এ সবকিছু থেকে পবিত্র। [মালহাতুল ইতিকাদ : ৩৯]

ইমাম সুবকি রহ.-এর কথাটা এক্ষেত্রে স্মরণ করা যেতে পারে :

والحنابلة أكثر فضلاء متقدميهم أشاعرة لم يخرج منهم عن عقيدة ا
لأشعرى إلا من لحق بأهل التجسيم وهم في هذه الفرقة من الحنابلة
أكثر من غيرهم.

পূর্ববর্তী হাম্বলি ইমামদের অধিকাংশজন আশআরি (অর্থাৎ আশআরিদের অনুরূপ আকিদা পোষণকারী)। তাদের মধ্য হতে আশআরির আকিদা থেকে শুধু তারাই বেরিয়ে গেছে, যারা দেহবাদীদের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে। হাম্বলিদের মধ্যে দেহবাদীদের সংখ্যা অন্যদের থেকে অনেক বেশি। [তাবাকাতুশ শাফিয়িয়াতিল কুবরা : ৩/৩৭৭]

ইমাম আবুল ইয়ুসর বাজদাওয়ি রহ. (মৃত্যু : ৪৯৩) লেখেন :

وقالت الحنابلة والكرامية واليهود ومن يقول إنه جسم: إنه تعالى
مستقر على العرش لكن بعضهم قالوا: له ست جهات كما لسائر الأ
جسام. وقال بعضهم: له جهة واحدة لا غير، استقر بها على العرش.

হাম্বলিরা, কাররামিয়া গোষ্ঠী, ইয়াহুদিরা এবং দেহবাদীরা বলে, আল্লাহ তাআলা আরশের ওপর অবস্থিত। তবে তাদের একদল বলে, অন্য সকল দেহের মতো তাঁর ছয় দিক আছে। আরেক দল বলে, তার কেবল একটি দিক রয়েছে; যা দ্বারা তিনি আরশের ওপর অবস্থান গ্রহণ করেছেন। [উসুলুদ দীন : ২৮] উল্লেখ্য, এখানে হাম্বলি দ্বারা পরবর্তী যুগের অধিকাংশ হাম্বলি উদ্দেশ্য।

শায়খ আবু বকর যাকারিয়া-০৮

শায়খ আবু বকর যাকারিয়ার সীমা-পরিধিসংক্রান্ত অভিমত আমরা উল্লেখ করেছি। দুই পর্বে এর পর্যালোচনাও উপস্থাপন করেছি। এ ব্যাপারে আরও বেশ কিছু কথা রয়ে গেছে। শায়খ যাকারিয়া একই টীকায় আরেকটা ভ্রান্ত আকিদা উল্লেখ করেছেন। আলোচনার সুবিধার্থে আমরা সেই বিষয়টি উল্লেখ করে একসঙ্গে উভয়টির পর্যালোচনা উপস্থাপন করব ইনশাআল্লাহ। তিনি লেখেন :

অনুরূপভাবে গ্রন্থকারের কথা ‘অন্যান্য সৃষ্ট বস্তুর ন্যায় ষষ্ঠ দিক তাঁকে বেষ্টন করে রাখতে পারে না’ এর দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে, সৃষ্টিগত ছয়টি দিক। এর দ্বারা মহান আল্লাহর উচ্ছে থাকা ও আরশের উপর তাঁর আরোহন করার বিষয়টি অস্বীকার করা উদ্দেশ্য নয়। কারণ এটি সৃষ্ট ছয় দিকের অভ্যন্তরে নয়। কারণ তিনি সৃষ্টিজগতের উপরে এবং সৃষ্টিজগতকে পরিবেষ্টন করে আছেন। মহান আল্লাহর সুউচ্ছে থাকার বিষয়টির ওপর ঈমান থাকা তিনি তাঁর বান্দাদের ফিতরাত তথা অন্তরে স্বাভাবিকভাবে গেঁথে দিয়েছেন। তাদের স্বাভাবিক অন্তরের কথা হচ্ছে যে, তিনি উপরের দিকে। এ বিষয়ে আহলে সুন্নাহ ওয়াল জামা‘আত তথা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াআলিহী ওয়াসাল্লামের সাহাবী এবং সুন্দরভাবে তাঁদের অনুসারী তাবেঈগণও এর ওপর একমত হয়েছেন। কুরআনে কারীম ও সহীহ মুতাওয়াতির (নিরঙ্কুশ নিঃসন্দেহে বিশ্বুদ্ধভাবে বর্ণিত) সুন্নাহ স্পষ্ট প্রমাণ দিচ্ছে যে, তিনি উপরে রয়েছেন। হে প্রিয় পাঠক এ বিষয়টি সম্পর্কে ভালোভাবে সাবধান থাকুন এবং জেনে রাখুন যে এটাই সত্য, এটা ব্যতীত অন্য কিছু বাতিল।

পূর্বের বক্তব্যসহ এ বক্তব্যে তার দাবিগুলো নিম্নরূপ :

(ক) আল্লাহ তাআলার সীমা-পরিধি রয়েছে, তবে তা আমাদের জ্ঞাত

দিন যায় দ্বীন বেচে

নয়।

(খ) আল্লাহ তাআলার আরশে আরোহণের (?) সীমা রয়েছে।

(গ) দিক দুই প্রকার—সৃষ্ট ও অসৃষ্ট। আল্লাহর সৃষ্ট দিক নেই। তবে অসৃষ্ট দিক রয়েছে।

(ঘ) সেই দিক হচ্ছে উপর দিক।

(ঙ) আল্লাহ উপর দিকে অবস্থিত হওয়ার বিষয়টি কুরআন, মুতাওয়াতির হাদিস, স্বভাব-প্রকৃতি, সাহাবি ও তাবেয়ীদের ইজমা দ্বারা প্রমাণিত এবং এটাই একমাত্র সত্য।

আমরা ধারাবাহিকভাবে প্রতিটি বিষয়ে ইমামগণের মতামত উল্লেখ করব এবং নব্য আসারিদের ভ্রান্তি স্পষ্ট করব ইনশাআল্লাহ। ইমাম আহমদ রহ.-এর মত আগের পর্বে বিগত হয়েছে। এখন আমরা পূর্ববর্তী অন্যান্য ইমামগণের বক্তব্য উদ্ধৃত করব। এখানে যে বিষয়টি স্পষ্ট থাকা প্রয়োজন, আহলুস সুন্নাহ আল্লাহ তাআলার জন্য ‘উলু’ তথা উচ্চতা সাব্যস্ত করেন। কিন্তু তারা এর সঙ্গে স্পষ্ট করে দেন যে, তা দ্বারা কোনো স্থান, দিক, সীমা-পরিসীমা, পার্শ্ব, পরিধি, ধরন এবং দেহের অন্যান্য বৈশিষ্ট্য উদ্দেশ্য নয়। বরং এ সবকিছু থেকে আল্লাহকে পবিত্র ঘোষণা করে তার জন্য ‘উলু’ সাব্যস্ত করাই তাদের উদ্দেশ্য। কেউ যদি দিক বা সীমা-পরিধিকে দু-ভাগে ভাগ করে বলে, আল্লাহ সৃষ্ট দিক ও সীমা-পরিধি থেকে মুক্ত; তবে অসৃষ্ট দিক ও সীমা-পরিধি তাঁর রয়েছে, তবে এর অর্থ হলো, শুধু আল্লাহ একাই নিত্য, অনাদি ও অসৃষ্ট নন; বরং তার সঙ্গে আরও কিছু নিত্য, অনাদি ও অসৃষ্ট বিষয় রয়েছে। যেমন : দিক। বলা বাহুল্য, এটা সুস্পষ্ট শিরক।

মূল আলোচনায় যাওয়ার আগে প্রথমে যে বিষয়টি স্পষ্ট হওয়া প্রয়োজন, আল্লাহ তাআলার জন্য ‘উলু’ (উচ্চতা) সাব্যস্ত করা অপরিহার্য। কারণ,

দিন যায় দ্বীন বেচে

খোদ কুরআনে এ শব্দ বিবৃত হয়েছে। কিন্তু কুরআন-হাদিসের কোথাও আল্লাহ তাআলার ব্যাপারে ‘দিক’ শব্দ প্রয়োগ হয়নি। তাই ‘উলু’কে উপর দিক দ্বারা ব্যাখ্যা করা সমর্থনযোগ্য হবে না। এ কারণেই ইমাম আহমদ বিন হাম্বল রহ. ‘উলু’ তো অপরিহার্যভাবেই সাব্যস্ত করতেন, যেমনটা আমরাও করে থাকি; কিন্তু কুরআন-হাদিসে বিবৃত না হওয়ায় নিজের পক্ষ থেকে মনগড়াভাবে ‘উপর দিক’ দ্বারা তার ব্যাখ্যা করতেন না, যেমনটা এই নব্য আসারিরা করে থাকে। ইমাম ইবনুল জাওযি রহ. লেখেন :

وكان أحمد لا يقول بالجهة للبارئ.

ইমাম আহমদ মহান স্রষ্টার জন্য দিকের কথা বলতেন না। [দাফউ শুবাহিত তাশবিহ : ৫৬]

ইমাম বদরুদ্দীন ইবনু জামাআহ রহ. লেখেন :

إن الإمام أحمد لا يقول بالجهة للبارئ تعالى.

নিশ্চয়ই ইমাম আহমদ মহান স্রষ্টার জন্য দিকের কথা বলতেন না। [ঈযাহুদ দালিল : ১০৮]

এখানে যে বিষয়টি না বললেই নয়, সালাফের অনুসারী হওয়ার দাবিদার হলেই কেউ প্রকৃত সালাফি হয়ে যায় না। আজকালকার আসারিরা হাফিজ ইবনুল কায়্যিম রহ.-এর নাম কতটা শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করে আর ইমাম আশআরি রহ.-এর নাম কতটা ঘৃণার সঙ্গে উচ্চারণ করে, তা পাঠকদের অজানা নয়। কিন্তু এখানে আমরা আলোচ্য বিষয়ে উপরিউক্ত উভয়জনের আকিদা উপস্থাপন করতে পারি; যাতে ধারণার সঙ্গে বাস্তবতা মিলিয়ে নেওয়া সহজ হয়। বলা বাহুল্য, কোনো মানুষই ভুলের উপ্ধে নয়। ভুল যেমন তৃতীয় শতাব্দীর ইমাম আশআরির হতে পারে, তার পাঁচশ বছরের জুনিয়র অষ্টম শতাব্দীর হাফিজ ইবনু কায়্যিম

দিন যায় দ্বীন বেচে

রহ.-এর তা আরও বেশি হতে পারে। উভয়েই সালাফের অনুসরণের চাহিদা রাখা সত্ত্বেও কোনো ক্ষেত্রে অজ্ঞাতসারে যেকোনোজন সালাফের মানহাজ থেকে ছিটকে পড়তে পারেন। স্মার্তব্য, দালিলিক আলোচনায় কাউকে বড় করা আর কাউকে হেয় করা উদ্দেশ্য হয় না; উদ্দেশ্য হয় চোখে আঙুল দিয়ে হাকিকত তুলে ধরা। মাজলুম ইমাম আশআরি রহ. (মৃত্যু : ৩২৪ হিজরি)-এর আকিদার স্বচ্ছতা লক্ষ করুন :

استوى على العرش كما أخبر، بلا كيف، ولا نقدم بين يدي الله في القول. وهذا اعتقاد أهل السنة والحديث، وسلفنا من الصحابة والتابعين، وهي عقيدة الإمام أحمد بن حنبل.

তিনি আরশের ওপর ইসতিওয়া করেছেন, যেমনটা তিনি বর্ণনা করেছেন—কোনো ধরন ছাড়া। আমরা আল্লাহ তাআলার সামনে শব্দপ্রয়োগে অগ্রসর হব না। এটা আহলুস সুন্নাহ ওয়াল হাদিসের আকিদা। আমাদের সালাফ সাহাবা ও তাবয়িদের আকিদা। আর এটাই ইমাম আহমদ ইবনু হাম্বল রহ.-এর আকিদা।

ইমাম আশআরি রহ. আল্লাহ তাআলার জন্য ইসতিওয়া সাব্যস্ত করেছেন। এর কোনো ধরন নির্ধারণ করেননি। স্থান, সীমা-পরিধি, দিক বা দৈহিক বৈশিষ্ট্যের কথা বলেননি। এবার এ প্রসঙ্গে হাফিজ ইবনুল কায়্যিম রহ. (মৃত্যু : ৭৫১)-এর আকিদা লক্ষ করুন, যা তিনিও ইমাম আহমদের নামে উল্লেখ করার প্রয়াস পেয়েছেন। তিনি বলেন:

استوى على العرش بمعنى: أحدث الله في ذاته معنى صار به على العرش وفوقه فوقية حسية تقوم على فارق المسافة، فالذي يصعد على رأس الجبل أو المنارة يكون أقرب إلى الله ممن هو أسفل منهما والله محدود من جهاته الست، وحدوده التي هي نهاياته وجوانبه المحيطة به لا يعلمها إلا هو، ولا ننكر أن الله قاعد على العرش، ثم الكرسي موضع قدمي الله تعالى، وأنه يجلس معه محمدا ﷺ، وهذه

দিন যায় দ্বীন বেচে

عقيدة الإمام أحمد وأهل الحديث وسلف الأمة وسائر الملل، حتى اليهود والنصارى هم أعلم بالله من الأشاعرة.

আল্লাহ আরশের ওপর আরোহণ করেছেন এই অর্থে যে, তিনি নিজের সত্তায় নতুনভাবে এমন বৈশিষ্ট্য সৃষ্টি করেছেন, যা দ্বারা তিনি আরশের ওপরে ও উর্ধ্বে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য অবস্থান গ্রহণ করেছেন; যা পার্থক্যের ব্যবধানের ওপর প্রতিষ্ঠিত। সুতরাং যে ব্যক্তি পাহাড় বা মিনারের ওপর উঠবে, সে এ দুটোর নিচে অবস্থানকারীর তুলনায় আল্লাহর অধিক নিকটবর্তী হবে। আল্লাহ তাঁর ছয় দিক থেকেই সীমাবদ্ধ। তার পরিধিসমূহ—যা তার শেষ সীমা ও তাকে বেষ্টনকারী পার্শ্ব, এর ব্যাপারে তিনিই অবগত। আমরা অস্বীকার করি না যে, আল্লাহ আরশের ওপর উপবিষ্ট (বসা) আছেন। এরপর কুরসি হলো আল্লাহ তাআলা উভয় পা রাখার জায়গা। আর এটাও অস্বীকার করি না যে, তিনি তার সঙ্গে মুহাম্মাদ ﷺ-কে বসাবেন। এটা ইমাম আহমদ, আহলে হাদিস, উম্মাহর সালাফ এবং সকল ধর্মের আকিদা। এমনকি ইহুদি ও খ্রিষ্টানরাও আল্লাহর ব্যাপারে আশআরিদের চাইতে অধিক জ্ঞানী।

তার উস্তাদ ইমাম ইবনু তাইমিয়া রহ.-এর বক্তব্যেও এর সমর্থন পাওয়া যায়। উদাহরণস্বরূপ, তিনি তার ‘মাজমুউল ফাতাওয়া’য় লেখেন :

أهل السنة والجماعة يثبتون أن الله على العرش، وأن حملة العرش أقرب إليه ممن دونهم، وأن ملائكة السماء العليا أقرب إلى الله من ملائكة السماء الثانية، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لما عرج به إلى السماء صار يزداد قرباً إلى ربه بعروجه وصعوده، وكان عروجه إلى الله لا إلى مجرد خلق من خلقه.

আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআত সাব্যস্ত করে যে, আল্লাহ আরশের ওপর রয়েছেন। আরশ বহনকারী ফেরেশতারা অন্যদের তুলনায় তাঁর অধিক নিকটবর্তী। প্রথম আসমানের ফেরেশতারা দ্বিতীয় আসমানের

দিন যায় দ্বীন বেচে

ফেরেশতাদের তুলনায় তাঁর অধিক নিকটবর্তী। রাসুলুল্লাহ ﷺ-কে যখন আসমানে মিরাজে নেওয়া হয়েছিল, তিনি তার উপরে ওঠা ও উর্ধ্বে আরোহণের দ্বারা তাঁর রবের অধিক নিকটবর্তী হচ্ছিলেন। তাঁর মিরাজ আল্লাহর নিকট হয়েছিল; শুধু তাঁর কোনো সৃষ্টির নিকট নয়।

এবার ইমাম আবু হানিফা রহ.-এর বক্তব্যের সঙ্গেও এই উক্তি দুটোর তুলনা করা যায়। ইমাম আবু হানিফা রহ. বলেন :

وليس قرب الله تعالى ولا بعده من طريق المسافة وقصرها ولكن على معنى الكرامة والهوان. والمطيع قريب منه بلا كيف، والعاصي بعيد عنه بلا كيف.

আল্লাহ তাআলার নৈকট্য ও দূরত্ব ব্যবধানের দূরত্ব ও সংক্ষিপ্ততার বিচারে নয়; বরং তা সম্মান ও তুচ্ছতার বিচারে। আনুগত্যকারী কোনো ধরন ছাড়া আল্লাহর নিকটবর্তী এবং পাপী কোনো ধরন ছাড়া আল্লাহ হতে দূরবর্তী।

نقر بأن الله على العرش استوى من غير أن يكون له حاجة إليه واستقرار عليه وهو الحافظ للعرش وغير العرش فلو كان محتاجا لما قدر على إيجاد العالم وتدبيره كالمخلوق ولو كان محتاجا إلى الجلوس والقرار فقبل خلق العرش أين كان الله تعالى فهو منزه عن ذلك علوا كبيرا.

আমরা স্বীকার করি, আল্লাহ তাআলা আরশের ওপর 'ইসতিওয়া' করেছেন আরশের প্রতি তার কোনো মুখাপেক্ষিতা ব্যতিরেকে এবং আরশের ওপর অবস্থান গ্রহণ করা ব্যতিরেকে। তিনি আরশ ও অন্য সবকিছুর সংরক্ষক। তিনি যদি মুখাপেক্ষী হতেন, তাহলে সৃষ্টিজীবের মতো তিনিও বিশ্ব সৃষ্টি করতে এবং তা পরিচালনা করতে সমর্থ হতেন না। তিনি যদি (আরশের ওপর) বসা ও অবস্থান গ্রহণ করার প্রতি মুখাপেক্ষী হতেন, তাহলে আরশ সৃষ্টির পূর্বে আল্লাহ তাআলা কোথায়

দিন যায় দ্বীন বেচে

ছিলেন? সুতরাং তিনি এ সবকিছু থেকে পবিত্র এবং অনেক উর্ধ্বে।

পূর্বে আমরা আলোচ্য বিষয়ে ইমাম আহমদ রহ.-এর বক্তব্য উল্লেখ করেছি। এখন এ বিষয়ে অন্যান্য ইমামগণের বক্তব্য লক্ষ্য করুন। ইমাম ইবনু হিব্বান রহ. (মৃত্যু : ৩৫৪ হিজরি) লেখেন :

الحمد لله الذي ليس له حد محدود فيحتوى، ولا له أجل معدود فيفنى، ولا يحيط به جوامع المكان، ولا يجتمع عليه تواتر الزمان، ولا يدرك نعتة بالشواهد والحواس، ولا يقاس صفات ذاته بالناس.

সকল প্রশংসা আল্লাহর, যার কোনো সীমিত সীমা-পরিধি নেই যে, তিনি বেষ্টিত হয়ে পড়বেন। তাঁর কোনো শেষ সময় নেই যে, তিনি বিনাশ হয়ে যাবেন। সর্বব্যাপী স্থানসমূহ তাঁকে পরিব্যাপ্ত করতে পারে না। কালের ধারাবাহিকতা তাঁর ওপর একত্র হয় না। দৃশ্য ও ইন্দ্রিয় বিষয় দ্বারা তাঁর গুণ উপলব্ধি করা যায় না। তাঁর সত্তার গুণাবলিকে মানুষের দ্বারা অনুমান করা যায় না। [আস-সিকাত : ১/১]

সর্বযুগেই সহিহ আকিদাকে গলদ হিসেবে উপস্থাপন করার অপপ্রয়াস চলেছে এবং গলদ আকিদাধারীরা নিজেদেরকে সহিহ বলে আখ্যায়িত করে হকপন্থীদের ওপর নির্মমভাবে চড়াও হয়েছে। ইমাম ইবনু হিব্বান রহ.-এর ক্ষেত্রেও এর ব্যতিক্রম হয়নি। তিনি নব্য আসারিদের মতো আল্লাহ তাআলার সীমা-পরিধি স্বীকার করতেন না বলে তাকে দেশ থেকে বহিস্কার করে দিয়েছিল এদের পূর্বসূরি তৎকালীন হকের ঠিকাদাররা। আবু ইসমাঈল হারাওয়ি হাম্বলি তার 'যামুল কালাম' বইয়ে (পৃ. ২৭৮) লেখেন :

وسألت يحيى بن عمار عن أبي حاتم بن حبان البستي، قلت: رأيت؟ قال: كيف لم أراه، ونحن أخرجناه من سجستان، كان له علم كبير ولم يكن له كثير دين، قدم علينا فأنكر الحد لله فأخرجناه من سجستان.

দিন যায় দীন বেচে

আমি ইয়াহইয়া ইবনু আম্মার (আসারি)-কে আবু হাতিম ইবনু হিব্বান বুসতি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে বললাম, আপনি তাকে দেখেছেন? তিনি বললেন, দেখব না কেন, অথচ আমরা তাকে সিজিস্তান থেকে বের করে দিয়েছিলাম! তার অনেক ইলম ছিল, কিন্তু তার বেশি দীন ছিল না। সে আমাদের মধ্যে এসে আল্লাহর সীমা-পরিধি অস্বীকার করেছে। তাই আমরা তাকে সিজিস্তান থেকে বের করে দিয়েছিলাম।

ইমাম তাজুদ্দীন সুবকি রহ. তার ‘কাযিদাতুন ফিল জারহি ওয়াত তাদিল’ গ্রন্থে (৩১) বড় দুঃখ করে লেখেন :

ومن ذلك قول بعض المجسمة في أبي حاتم بن حبان: (لم يكن له كبير دين، نحن أخرجناه من سجستان؛ لأنه أنكر الحد لله). فإليت شعري من أحق بالإخراج؟ من يجعل ربه محدودا أو من ينزهه عن الجسمية.

এমনই একটি বিষয় হলো, আবু হাতিম ইবনু হিব্বান রহ.-এর ব্যাপারে জনৈক দেহবাদীর মন্তব্য—‘ তার বেশি দীন ছিল না। সে আমাদের মধ্যে এসে আল্লাহর সীমা-পরিধি অস্বীকার করেছে। তাই আমরা তাকে সিজিস্তান থেকে বের করে দিয়েছিলাম।’ হয়, আমি যদি জানতাম, কে বহিস্কৃত হওয়ার অধিক হকদার ছিল? যে তার রবকে সীমাবদ্ধ বানিয়ে ফেলে সে নাকি ওই ব্যক্তি, যে তার রবকে দেহের বৈশিষ্ট্য থেকে পবিত্র ঘোষণা করে?

একই ধরনের কথা তার ‘তবাকাত’ গ্রন্থেও (৩/১৩২-১৩৩) উল্লেখ করে বলেন :

أنظر ما أجهل هذا الجارح، وليت شعري من المجروح؟ مثبت الحد لله أو نافيهِ؟

দেখো, এই সমালোচক কত বড় গণ্ডমূর্খ! হয়, আমি যদি জানতাম,

দিন যায় দ্বীন বেচে

কে সমালোচনাযোগ্য? আল্লাহর জন্য সীমা-পরিধি সাব্যস্তকারী নাকি তা নাকচকারী।

হাফিজ ইবনু হাজার আসকালানি রহ. লেখেন :

والحق أن الحق مع ابن حبان فيها.

প্রকৃত সত্য হলো, এক্ষেত্রে হক ইবনু হিব্বান রহ.-এর সঙ্গেই ছিল।

[লিসানুল মিজান : ৭/৪৯-৫০]

দুঃখজনক বাস্তবতা হলো, আকিদার জন্য জুলুম সয়ে নেওয়ার প্রসঙ্গ উত্থাপিত হলে শুধু মুতাজিলা কর্তৃক ইমাম আহমদের জুলুমের ঘটনাই উঠে আসে। কিন্তু যুগে যুগে নব্য আসারি নামধারীরা আহলুস সুন্নাহর ইমামগণের সঙ্গে কী নির্মম আচরণ করেছে, তাদের হৃদয়বিদারক আখ্যানগুলো পর্দার আড়ালেই থেকে যায়। ইমাম ইবনু হিব্বানদের জন্য অশ্রু ঝরানোর কেউই নেই।

শায়খ আবু বকর যাকারিয়া-০৯

ইমাম কালাবাজি রহ. (মৃত্যু : ৩৮০ হিজরি) ‘আত-তাআরুফ’ গ্রন্থে ৬৮ জন সালাফ ইমামের নাম উল্লেখ করে তাদের আকিদা বর্ণনা করেন। তার ভাষায় তিনি যে ৬৮ জন ইমামের আকিদা বর্ণনা করেন তারা হলেন—

আলি ইবনুল হুসাইন যাইনুল আবিদিন, মুহাম্মাদ ইবনু আলি বাকির, জাফর সাদিক, উওয়াইস কারনি, হারাম ইবনু হাইয়ান, হাসান বসরি, সালামা ইবনু দিনার, মালিক ইবনু দিনার, আবদুল ওয়াহিদ ইবনু যায়দ, উতবা আল-গুলাম, ইবরাহিম ইবনু আদহাম, ফুজায়ল ইবনু ইয়াজ, আলি ইবনু ফুজায়ল, দাউদ তাঈ, সুফয়ান সাওরি, সুফয়ান ইবনু উয়াননা, আবু সূলায়মান দারানি, সূলায়মান দারানি, ইবনুল হাওয়ারি,

দিন যায় দ্বীন বেচে

যুন্নুন মিসরি, যুলকিফল মিসরি, সারি সাকাতি, বিশর হাফি, মারুফ কারখি, মারআশি, ইবনুল মুবারক সুরি, ইউসুফ ইবনু আসবাত, আবু ইয়াজিদ বাসতামি (যিনি ‘বায়জিদ বোস্তামি’ নামে পরিচিত), আবু হাফস উমর নিশাপুরি, আহমদ বালখি, সাহল ইবনু আবদিল্লাহ, ইউসুফ রাজি, আবু বকর আবহারি, আলি ইস্পাহানি, আলি বারিজি, আবু বকর দিনাওয়ারি, আবু মুহাম্মাদ রাহানি, আব্বাস দিনাওয়ারি, কাহমাস হামাদানি, হুসায়ন ইয়াজদানিয়ার, জুনায়েদ বাগদাদি, আহমদ নুরি, আহমদ খাররায়, রুওয়াইম, আহমদ বাগদাদি, আমর মাক্কি, ইউসুফ সুসি, ইসহাক নাহরাজুরি, হাসান জারিরি, ইবরাহিম খাওয়াস, আবু আলি আওরাজি, মুহাম্মাদ ওয়াসিতি, আবু আবদিল্লাহ হাশিমি, আবু আবদিল্লাহ হাইকাল কুরাশি, আবু আলি রুযাবারি, আবু বকর কাহতি, আবু বকর শিবলি, আবদুল্লাহ মুরতায়িশ, আহমদ ইবনু আসিম, আবদুল্লাহ আনতাকি, হারিস মুহাসিবি, ইয়াহইয়া রাজি, মুহাম্মাদ ওয়াররাক তিরমিজি, সাঈদ রাজি, মুহাম্মাদ ইবনু আলি তিরমিজি, মুহাম্মাদ ইবনু ফজল বালখি, আবু আলি জুযাজানি, আবুল কাসিম সামারকান্দি।

সবার নাম ও বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করার পর তিনি তাদের সর্বসম্মত আকিদার বিবরণ দেন—

ليس بجسم... ولا يتحرك ولا يسكن... ولا بذى جهات ولا أماكن... و لا تعينه الإشارات، لا يحويه مكان، ولا يجري عليه زمان، لا تجوز عليه المماسّة ولا العزلة، ولا الحلول في الأماكن... إن قلت: كيف؟ فقد احتجبت عن الوصف بالكيفية ذاته. إن قلت: أين؟ فقد تقدم المكان وجوده... ليس لذاته تكييف.

তিনি কোনো দেহ নন। তিনি নড়াচড়া করেন না, স্থবিরও হন না। তিনি দিক বা স্থানবিশিষ্ট নন। ইশারা-ইঙ্গিত তাকে নির্দিষ্ট করতে পারে না। কোনো স্থান তাকে বেষ্টন করে রাখে না। তার ওপর কাল প্রয়োগ হয়

দিন যায় দ্বীন বেচে

না। স্পর্শ করে থাকে, বিচ্ছিন্ন হওয়া বা স্থানে অবতারণিত হওয়া তার ব্যাপারে প্রযোজ্য হয় না। যদি বলো, তিনি কেমন? তাহলে কথা হলো, তাঁর সত্তা কেমনতরুর গুণে গুণান্বিত হওয়া থেকে উর্ধ্বে। যদি বলো, তিনি কোথায়? তাহলে কথা হলো, স্থান সৃষ্টির পূর্ব থেকেই তাঁর অস্তিত্ব রয়েছে। তাঁর সত্তার কোনো ধরন নেই।

আহ, সালাফগণের এত স্পষ্ট বক্তব্যের পরও যদি আমার জাতি বুঝত! নিজের বিবেক-বুদ্ধি বন্ধক রাখলেই কেবল কারও পক্ষে নব্য আসারিদের ফাঁদে পা দেওয়া সম্ভব। আল্লাহ তাআলার জন্য স্থান, সীমা, পরিধি, স্থানান্তর, দিক ও অন্যান্য ধরন সাব্যস্ত করা সম্ভব। ইমাম কালাবাজি রহ. চতুর্থ শতাব্দীর মহান ইমাম। তিনি যে ৬৮ জনের নাম উল্লেখ করেছেন, এগুলো শুধু যে তাদের আকিদা—বিষয়টি এমন নয়। বরং তিনি তার বইয়ে স্পষ্টভাবে বলেন :

ولم نذكر المتأخرين وأهل العصر، وإن لم يكونوا دون من ذكرنا علما
؛ لأن الشهود يغني عن الخبر عنهم.

আমরা পরবর্তী ও সমসাময়িক ইমামদেরর বিবরণ উল্লেখ করব না; যদিও তারা উল্লেখিতদের চাইতে ইলমে ছোট না হন। কারণ, তারা যেহেতু উপস্থিত রয়েছেন। তাই তাদের বিবরণ উল্লেখ করার প্রয়োজন নেই।

ইমাম কুশায়রি রহ. (মৃত্যু : ৪৬৫ হিজরি) যেহেতু তার এক শতাব্দী পরের মনীষী, তাই তিনি তার জগদ্বিখ্যাত কালজয়ী গ্রন্থে ‘আর-রিসালাতুল কুশায়রিয়াহ’তে উপরিউক্ত ৬৮ জন সালাফ ইমামের নাম উল্লেখ করার পর এর সঙ্গে আরও ৪৬ জন বিশিষ্ট ইমামের নাম যোগ করে তাদের সর্বসম্মত আকিদার বিবরণ উল্লেখ করেন। তিনি আরও যাদের নাম এনেছেন তারা হলেন—

আবু আলি শাকিক বালখি, হাতিম আসাম, আবু তুরাব নাখশাবি, আবুস

দিন যায় দ্বীন বেচে

সাররি মানসুর, আবু সালিহ কাসসার, আবু উসমান জাবরি, আহমদ ইবনু ইয়াহইয়া আল-জালা, আহমদ যাককাক কাবির, সুহনুন ইবনু হামজা, আবুল ফাওয়ারিস শাহ ইবনু শুজা, ইউসুফ ইবনুল হুসায়ন, মুহাম্মাদ ইবনু ইসমাইল মাগরিবি, আহমদ আবুল আব্বাস, আবু মুহাম্মাদ খাররাজ, আবুল হাসান বানান হাম্মাল, আবু হামজা বাগদাদি বাযযার, আবুল হাসান ইবনুস সাইগ, ইবরাহিম ইবনু দাউদ রাকি, মমশাদ দিনাওয়ারি, খাইর নাসসাজ, আবু হামজা খুরাসানি, আবদুল্লাহ ইবনু মানাজিল, মুহাম্মাদ ইবনু আবদিল ওয়াহাব সাকফি, আবুল খায়র আকতা, আবদুল্লাহ ইবনু মুহাম্মাদ কান্তানি, আবুল হাসান ইবনু মুহাম্মাদ মুজাইন, আবু আলি ইবনু কাতিব, মুজাফফর কারমিসিনি, আবুল হুসাইন ইবনু বানান, ইবরাহিম ইবনু শাইবান কারমিসিনি, আবু সাইদ আরাবি বসরি, আবু আমর যাজজাজি নিশাপুরি, আবু মুহাম্মাদ জাফর ইবনু মুহাম্মাদ, আবুল আব্বাস সাইয়ারি, আবদুল্লাহ ইবনু মুহাম্মাদ রাজি, ইসমাইল ইবনু নাজিদ, আবুল হাসান আলি বুশানজি, মুহাম্মাদ ইবনু খাফিফ শিরাজি, বুনদার শিরাজি, আবু বকর তামাস্তানি, আবুল আব্বাস আহমাদ ইবনু মুহাম্মাদ দিনাওয়ারি, সাইদ ইবনু সালাম মাগরিবি, ইবরাহিম ইবনু মুহাম্মাদ নাসরাবাজি, আলি ইবনু ইবরাহিম হাসরি এবং আবু আবদিল্লাহ ইবনু আহমদ রুযাবারি রহ.।

আমাদের বঙ্গদেশীয় সালাফি নামধারীরা দিনমান সালাফের নাম বিকিয়ে খেলেও প্রথম সারির এসকল সালাফের কয়জনের নাম শুনেছে, আল্লাহ ভালো জানেন। ইমাম কুশায়রি রহ. ধারাবাহিকভাবে সকলের নাম উল্লেখ করে এরপর তাঁদের সর্বসম্মত আকিদার বিবরণ তুলে ধরেন—

إن الحق سبحانه وتعالى موجود... ليس بجسم... ولا له جهة ولا مكان، ولا يجري عليه وقت ولا زمان، ولا يخصصه هيئة وقد، ولا يقطعه نهاية وحد، ولا يحله حادث... لا يقال له: أين، ولا حيث، ولا

দিন যায় দ্বীন বেচে

كيف، ولا يستفتح له وجود فيقال: متى كان؟ ولا ينتهي له بقاء... فيقال: استوفى الأجل والزمان

নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআলা বিদ্যমান রয়েছেন। তিনি কোনো দেহ নন। তাঁর কোনো দিক নেই, কোনো স্থান নেই। সময় ও কাল তাঁর ওপর প্রযোজ্য হয় না। তাঁর কোনো আকার ও আকৃতি নেই। কোনো পরিসীমা ও পরিধি তাঁকে অতিক্রম করে না। অনিত্য কিছু তাঁর মধ্যে অবতারণিত হয় না। ‘কোথায়’, ‘কোন অবস্থানে’, ‘কেমন’—এ শব্দগুলো তাঁর ব্যাপারে বলা যাবে না। তাঁর অস্তিত্বের সূচনা সম্পর্কেও প্রশ্ন করা যাবে না যে, তিনি কখন থেকে ছিলেন? তাঁর অস্তিত্বের কোনো সমাপ্তিও নেই। তাই বলা যাবে না যে, তিনি সময় ও মেয়াদ পূর্ণ করে ফেলেছেন।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, বঙ্গদেশীয় সালাফি দাবিদারদের দু-ভাগ : (ক) একদল বলে, আল্লাহর আকার-আকৃতি আছে। (খ) আরেক দল বলে, তার আকার-আকৃতি আছে বা নেই, কোনোটি বলা যাবে না। উভয়টি বলা বিদআত। তার আকার-আকৃতি থাকা সম্ভব। তবে কুরআন-হাদিসে যেহেতু এ ব্যাপারে কিছু আসেনি, তাই আমরা নীরব থাকব। তারা এসব আকিদা সালাফের নামে বাজারজাত করে। অথচ উপরের বক্তব্য পড়ুন। একবার নয়, বারবার পড়ুন।

‘তাঁর কোনো আকার ও আকৃতি নেই।’

হায়, কে বোঝাবে এই স্বঘোষিত হকের ঠিকাদারদের! কেউ আল্লাহর আকার ও আকৃতি অস্বীকার করলে তারা তাকে নাস্তিক বলতেও দ্বিধা করে না। আজই একজনের মন্তব্য চোখে পড়ল, হিন্দুরাও বলে আল্লাহ নিরাকার, হানাফিরাও বলে আল্লাহ নিরাকার। তাহলে হানাফিরা কি হিন্দু? তাদের অনেক শায়খের লেখায়ই পাওয়া যায়, আল্লাহকে নিরাকার বলা নাকি অস্তিত্বহীন বলার নামান্তর।

এরপর আবারও পড়ুন।

দিন যায় দ্বীন বেচে

'তাঁর কোনো দিক নেই, কোনো স্থান নেই।'

এরা বলবে, না তাঁর উপর দিক রয়েছে। একইভাবে তাঁর স্থানও রয়েছে; তবে তা তাঁর সত্তার মতোই অসৃষ্ট ও অনাদি।

এরপর আবার পড়ুন।

'কোনো পরিসীমা ও পরিধি তাঁকে অতিক্রম করে না।'

এরা বলবে, তাঁর জ্ঞাত সীমা-পরিধি নেই; অজ্ঞাত সীমা-পরিধি রয়েছে।

এরপর আবার পড়ুন।

'কোথায়', 'কোন অবস্থানে', 'কেমন'—এ শব্দগুলো তাঁর ব্যাপারে বলা যাবে না।

অথচ এদের আকিদার পাঠ শুরুই হয় এসব দিয়ে। আল্লাহ কোথায়? তাঁর অবস্থান কোথায়? কেউ এসব বিষয় চর্চা করতে না করলেও তাকে সালাফবিরোধী ট্যাগ দিয়ে বসে। আল্লাহর ব্যাপারে 'অবস্থান' শব্দটি প্রচুর কনফিডেন্সের সঙ্গে লেখে।

এরপর আবারও পড়ুন।

'কোনো পরিসীমা ও পরিধি তাঁকে অতিক্রম করে না। অনিত্য কিছু তাঁর মধ্যে অবতারিত হয় না।'

অথচ এরা বলবে, আল্লাহর সীমা-পরিসীমা ও পরিধি রয়েছে, তবে তা আমাদের অজ্ঞাত। আরশ সৃষ্টির পরে তিনি তার ওপর আরোহণ করেছেন। এই অনিত্য বিষয়টি তার সঙ্গে নতুনভাবে সংযুক্ত হয়েছে।

শায়খ আবু বকর যাকারিয়া-১০

ইমামগণের সুস্পষ্ট কথাকে বিকৃত করে মান্য করার নাম নব্য সালাফি মতবাদ। আর তাদের কথাগুলোকে অবিকৃতভাবে মান্য করা হলো আহলুস সুন্নাহর বৈশিষ্ট্য। কিন্তু দুঃখজনক বাস্তবতা হলো, এই নব্য বিদআতি গোষ্ঠীই আহলুস সুন্নাহকে বিভিন্ন অসার অভিযোগে অভিযুক্ত করার চেষ্টা করে এবং নিজেদের ছাঁচে ফেলে মহান সালাফগণকে বিচার করে। তারা যদি শুধু অক্ষরবাদে সীমাবদ্ধ থাকত, তা-ও হতো। কিন্তু তারা গোটা শরিয়াহকে নিজেদের অপরিণত মস্তিষ্কের অনুগামী বানিয়ে ফেলেছে আর কিছু অক্ষরবাদী দর্শন ও সালাফের বিকৃত বা বিচ্ছিন্ন উক্তি দ্বারা নিজেদের হক প্রমাণের অপচেষ্টা চালিয়েছে। যার অনেক দৃষ্টান্ত ইতিমধ্যে পাঠকদের সামনে চলে এসেছে। বলা বাহুল্য, ব্যক্তি ও মতবাদপূজা বা দলাদলিতা থেকে বেরিয়ে আসতে চাইলে সংকীর্ণতার চশমা খুলতে হবে এবং নিরপেক্ষভাবে অধ্যয়ন ও গবেষণা করতে হবে। শুধু নিজস্ব সার্কেলের গুরুদের লেখার মধ্যে নিজেকে সীমাবদ্ধ রাখলে সারাজীবন কুয়োর ব্যাঙ হয়েই থাকতে হবে। এবার চলুন, শায়খ আবু বকর যাকারিয়ার আকিদা প্রসঙ্গে আরও কিছু সর্বজনশ্রদ্ধেয় ইমামের অবস্থান লক্ষ করি।

ইমাম খাত্তাবি রহ. 'আর-রিসালাতুন নাসিহাহ' গ্রন্থে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কিছু বাস্তবতা তুলে ধরেন :

ومما يجب أن يعلم في هذا الباب ويحكم القول فيه أنه لا يجوز أن يعتمد في الصفات إلا الأحاديث المشهورة إذ قد ثبت صحة أسانيدنا وعدالة ناقلها فإن قوما من أهل الحديث قد تعلقوا منها بألفاظ لا تصح من طريق السند وإنما هي من رواية المفاريد و الشواذ فجعلوها أصلا في الصفات وأدخلوها في جملتها كحديث الشفاعة وما روي فيه من قوله صلى الله عليه وسلم "فأعود إلى

দিন যায় দ্বীন বেচে

ربي فأجده بمكانه أو في مكانه" فزعموا على هذا المعنى أن الله تعالى مكانا تعالى الله عن ذلك وإنما هذه لفظة تفرد بها من هذه القصة شريك بن عبد الله ابن أبي نمر وخالفه أصحابه فيها ولم يتابعوه عليها وسبيل مثل هذه الزيادة أن ترد ولا تقبل لاستحالتها و لأن مخالفة أصحاب الراوي له روايته كاختلاف البيئة وإذا تعارضت البيتان سقطتا معا وقد تحتمل هذه اللفظة لو كانت صحيحة أن يكون معناها أن يجد ربه عز وجل بمكانه الأول من الإجابة في الشفاعة والإسعاف بالمسألة إذ كان مرويا في الخبر أنه يعود مرارا فيسأل ربه تعالى في المذنبين من أمته كل ذلك يشفعه فيهم ويشفعه في مسألتهم.

এক্ষেত্রে যে বিষয়টি জেনে রাখা এবং দ্ব্যর্থহীনভাবে বলা অপরিহার্য তা হলো, সিফাত বিষয়ক আলোচনার ক্ষেত্রে শুধু মাশহুর (প্রসিদ্ধির সাথে প্রমাণিত) হাদিসের ওপর নির্ভর করা যাবে। কারণ, এ প্রকারের হাদিসের বর্ণনাসূত্রের বিশ্বস্ততা ও বর্ণনাকারীদের ন্যায়পরায়ণতা প্রমাণিত। এক দল আহলে হাদিস এমন সব শব্দকে আঁকড়ে ধরেছে, যা বর্ণনাসূত্রের বিবেচনায় প্রমাণিত নয়। কারণ, তা একক ও বিচ্ছিন্ন বর্ণনাকারীদের বর্ণনা। তারা এ ধরনের হাদিসকে সিফাতের আলোচনায় মূল ধরে নিয়েছে এবং এগুলোকে সিফাতের অন্তর্ভুক্ত করে বসেছে।

যেমন, শাফাআতের হাদিসটি লক্ষ করা যেতে পারে। তাতে রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণনা করা হয়েছে, 'আমি আমার রবের কাছে ফিরে আসলাম। তখন তাঁকে তাঁর জায়গায় পেয়ে গেলাম।' এর ওপর ভিত্তি করে তারা দাবি করে বসেছে, আল্লাহ তাআলার স্থান রয়েছে। অথচ এ থেকে আল্লাহ অনেক উর্ধ্বে। তাছাড়া এটি এমন একটি শব্দ, এই ঘটনা বর্ণনা প্রসঙ্গে যা শারিক ইবনু আবদিল্লাহ ইবনি আবি নামর বর্ণনাকারী এককভাবে বর্ণনা করেছে; তার অন্যান্য সঙ্গীরা এক্ষেত্রে তার বিরোধিতা করেছে। তারা এর সমর্থনেও অনুরূপ কোনো বর্ণনা উল্লেখ করেনি।

দিন যায় দ্বীন বেচে

এ ধরনের অতিরিক্ত শব্দের ক্ষেত্রে নীতি হলো, এগুলোকে প্রত্যাখ্যান করা হবে। কোনোভাবেই গ্রহণ করা হবে না। কারণ, এটা অসম্ভব ব্যাপার। তাছাড়া বর্ণনাকারীর ছাত্ররা তার বিরোধিতা করা প্রমাণের ভিন্নতার মতো। যখন দুটো প্রমাণ পরস্পর বিরোধী হয়, তখন উভয়টি একইসাথে পরিত্যাজ্য হয়। তাছাড়া হাদিসটি সহিহ হলেও এর অর্থ ধরা হবে, তিনি তার রবকে শাফাআত কবুল করা এবং সমস্যা হতে উদ্ধার করার ক্ষেত্রে পূর্বের অবস্থায় পেয়েছেন। যেহেতু হাদিসে বর্ণিত রয়েছে যে, তিনি বারবার এসে তার রবের কাছে গুনাহগার উম্মতের ব্যাপারে (ক্ষমা) প্রার্থনা করবেন। অনন্তর তাদের ব্যাপারে তিনি তার শাফাআত কবুল করে তাদেরকে শাস্তি হতে পরিত্রাণ দেবেন।

ومن هذا الباب أن قوما منهم زعموا أن لله حدا وكان أعلا ما احتجوا به في ذلك حكاية عن ابن المبارك قال علي بن الحسن بن شقيق: قلت لابن المبارك: نعرف ربنا بحد أو نثبت به بحد؟ فقال: نعم بحد فجعلوه أصلا في هذا الباب وزادوا الحد في صفاته تعالى الله عن ذلك سبيل هؤلاء القوم عفانا الله وإياهم أن يعلموا أن صفات الله تعالى لا تؤخذ إلا من كتاب أو من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم دون قول أحد من الناس كائنا من كان علت درجته أو نزلت تقدم زمانه أو تأخر لأنها لا تدرك من طريق القياس والاجتهاد فيكون فيها لقائل مقال ولناظر مجال على أن هذه الحكاية قد رويت لنا أنه قيل له: أنعرف ربنا بحد؟ قال: نعم بحد "بالجيم" لا بالحاء وزعم بعضهم أنه جائز أن يقال له تعالى حد لا كالحودود كما نقول يد لا كالأيدي فيقال له إنما أحوجنا إلى أن نقول يد لا كالأيدي لأن اليد قد جاء ذكرها في القرآن وفي السنة فلزم قبولها ولم يجوز ردها فأين ذكر الحد في الكتاب والسنة حتى نقول: حد لا كالحودود كما نقول يد لا كالأيدي؟! رأييت إن قال جاهل: رأس لا كالرؤوس قياسا على قولنا يد لا كالأيدي هل يكون الحجة عليه إلا نظير ما ذكرناه في الحد من أنه لما جاء ذكر اليد وجب القول به ولما يجئ ذكر

দিন যায় দ্বীন বেচে

الرأس لم يجز القول به؟!

এ ধরনের আরেকটি বিষয় হলো, কিছু মানুষ দাবি করে, আল্লাহ তাআলার সীমা-পরিধি রয়েছে। এ ব্যাপারে তারা যা কিছু দ্বারা প্রমাণ উপস্থাপন করে এর শীর্ষে হলো ইবনুল মুবারকের একটি বর্ণনা। আলি ইবনুল হাসান ইবনু শাকিক বলেন, আমি ইবনুল মুবারককে জিজ্ঞেস করলাম, আমরা আমাদের রবকে পরিধিসহ জানব বা তাকে পরিধিসহ সাব্যস্ত করব? তিনি বললেন, হ্যাঁ, পরিধিসহ। তারা এ বিষয়ে এটাকে মূল দলিল হিসেবে ধরে নিয়েছে এবং আল্লাহ তাআলার গুণাবলিতে ‘সীমা’ অতিরিক্ত সংযোজন করেছে। আল্লাহ এ থেকে অনেক উর্ধ্বে।

এসব লোকের নীতি হলো—আল্লাহ আমাদের এবং তাদের রক্ষা করুন—তারা ভালোভাবেই জানে যে, আল্লাহর সিফাতসমূহ শুধু কুরআন এবং রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর বাণী থেকেই গ্রহণ করা যায়; অন্য কারও কথা থেকে নয়—সে যে-ই হোক না কেন, তার মর্যাদা অনেক ওপরে হোক বা হোক নিচে, তার সময়কাল পূর্ববর্তী হোক বা হোক পরবর্তী। কারণ, আল্লাহর সিফাতসমূহ ইজতিহাদ বা কিয়াস দ্বারা গ্রহণ করা যায় না যে, কোনো কথকের তাতে কথা থাকবে বা কোনো গবেষকের মত প্রদানের সুযোগ থাকবে। তথাপি এই উক্তিটি আমাদের নিকট এভাবেও বর্ণিত হয়েছে যে, তাকে জিজ্ঞেস করা হলো, আমরা কি আমাদের প্রভুকে মহিমা দ্বারা চিনব? তিনি বললেন, হ্যাঁ, মহিমা দ্বারা। অর্থাৎ, পরিধি (حد)-এর স্থলে মহিমা (جد) শব্দ এসেছে।

তাদের কেউ কেউ দাবি করেছে, আল্লাহ তাআলার ব্যাপারে এ কথা বলা জাযিয় যে, তার পরিধি রয়েছে, তবে অন্যান্য পরিধির মতো নয়; যেমন আমরা বলে থাকি, হাত রয়েছে, তবে অন্যান্য হাতের মতো নয়। এসব লোককে বলা হবে, আমরা ‘হাত রয়েছে, তবে অন্যান্য হাতের মতো নয়’ বলতে বাধ্য হয়েছি এ কারণে যে, কুরআন এবং সুন্নাহয় তা উল্লেখিত হয়েছে। সুতরাং তা গ্রহণ করা আবশ্যিক, প্রত্যাখ্যান করা

দিন যায় দ্বীন বেচে

নাজায়িয। কিন্তু কুরআন-সুন্নাহয় পরিধির কথা কোথায় আছে যে এখন আমাদের বলতে হবে, তার পরিধি রয়েছে, তবে অন্যান্য পরিধির মতো নয়; যেমন আমরা বলে থাকি, হাত রয়েছে, তবে অন্যান্য হাতের মতো নয়। আচ্ছা, তোমার কী অভিমত, ‘হাত রয়েছে, তবে অন্যান্য হাতের মতো নয়’—এর ওপর অনুমান (কিয়াস) করে কোনো মূর্খ যদি বলে, ‘মাথা রয়েছে, তবে অন্যান্য মাথার মতো নয়’? তার দাবির বিপক্ষে আমাদের প্রমাণ কি শুধু তা-ই হবে না, যা আমরা পরিধি প্রসঙ্গে বললাম—অর্থাৎ, হাতের কথা যেহেতু উল্লেখ হয়েছে, তাই তা বলা আবশ্যিক। আর মাথার কথা যেহেতু উল্লেখ হয়নি, তাই তা বলা নাজায়িয? [বায়ানু তালবিসিল জাহমিয়াহ : ১/৪৪১-৪৪২]

‘সুনানু আবি দাউদ’ গ্রন্থে (হাদিস : ৪৭২৬) এক অত্যধিক দুর্বল হাদিসে বর্ণিত হয়েছে :

وَيَحْكُ أَتَذْرِي مَا اللَّهُ، إِنَّ عَرْشَهُ عَلَى سَمَاوَاتِهِ لَهَكَذَا» وَقَالَ بِأَصَابِعِهِ مِثْلَ الْقَبَةِ عَلَيْهِ «وَأِنَّهُ لَيُطُّ بِهِ أَطْيَطُ الرَّحْلِ بِالرَّاكِبِ» قَالَ ابْنُ بَشَّارٍ «فِي حَدِيثِهِ: «إِنَّ اللَّهَ فَوْقَ عَرْشِهِ، وَعَرْشُهُ فَوْقَ سَمَاوَاتِهِ

তোমার সর্বনাশ হোক। তুমি কি আল্লাহর মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে কিছু জানো? মহান আল্লাহর আরশ তাঁর আসমানের উপর এরূপ। এ বলে তিনি তাঁর আঙুলসমূহে গম্বুজের মতো করে ইশারা করেন। এতদসত্ত্বেও আরশ তাঁকে নিয়ে গোঙানির মতো শব্দ করে, যেমনটি করে আরোহীর কারণে জিনপোষ। মহান আল্লাহ তাঁর আরশের উপর এবং তাঁর আরশ তাঁর সৃষ্ট আসমানসমূহের উপর।

ইমাম খাত্তাবি রহ. এই অপ্রমাণিত হাদিসের ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে বলেন :

هذا الكلام إذا جرى على ظاهره كان فيه نوع من الكيفية، والكيفية عن الله وصفاته منفية، فعقل أن ليس المراد تحقيق هذه الصفة، ولا تحديده على هذه الهيئة، وإنما هو كلام تقريب، أريد به تقرير عظمة

দিন যায় দ্বীন বেচে

اللَّهُ وجلاله سبحانه، وإنما قصد به إفهام السائل من حيث يدركه فهمه... تعالى الله أن يكون مشبها بشيء، أو مكيفا بصورة خلق، أو مدركا بحد، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير.

এই কথাটিকে তার বাহ্যিক অর্থে প্রয়োগ করলে এতে এক প্রকারের ধরন সৃষ্টি হয়। অথচ আল্লাহ ও তাঁর গুণাবলি থেকে ধরন নাকচকৃত। সুতরাং বোঝা গেল, উদ্দেশ্য এই গুণ সাব্যস্ত করা বা এই আকৃতির ওপর তাকে সংজ্ঞায়িত করা নয়। এটা সহজে বোঝানোর জন্য বলা একটি কথা। এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো পূতপবিত্র আল্লাহর মাহাত্ম্য ও মহিমা সাব্যস্ত করা। প্রশ্নকারীর বোধ যেভাবে সহজে উপলব্ধি করে নিতে পারে, তাকে সেভাবে বোঝানোর মানসে কথাটা এভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে। কোনো কিছুই সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ হওয়া, কোনো সৃষ্টির আকৃতিতে রূপায়িত হওয়া কিংবা কোনো পরিধি দ্বারা উপলব্ধ হওয়া থেকে তিনি অনেক উর্ধ্বে। তাঁর অনুরূপ কিছুই নেই। তিনিই সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা। [মআলিমুস সুনান : ৭/৯৪]

وليس معنى قول المسلمين (إن الله استوى على العرش) هو مما س له، أو متمكن فيه، أو متحيز في جهة من جهاته، لكنه بائن من جميع خلقه، إنما هو خبر جاء به التوقيف فقلنا به، ونفينا عنه التكييف، إذ ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير.

মুসলমানরা যে বলে, আল্লাহ আরশের ওপর ইসতিওয়া করেছেন—এর অর্থ এ নয় যে, তিনি তা স্পর্শ করে আছেন, তাতে অবস্থান গ্রহণ করেছেন কিংবা তিনি কোনো দিকে স্থান গ্রহণ করে আছেন। বরং তিনি তাঁর সকল সৃষ্টি থেকে পৃথক। এটি হলো এমন সংবাদ, যা নুসুসে বিবৃত হয়েছে; তাই আমরা এ কথা বলেছি এবং তাঁর থেকে ধরন নাকচ করেছি। কারণ, কোনো কিছুই তাঁর অনুরূপ নয়। তিনিই সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা। [আ'লামুল হাদিস, কিতাবু বাদয়িল খালক, বাবু মা জাআ ফি কাওলিহি তাআলা 'ওয়া হুওয়াল্লাযি ইয়াবদাউল খালকা'; ফাতহুল

দিন যায় দ্বীন বেচে

বারি : ১৩;৫০৫, কিতাবুত তাওহিদ, বাবু 'ওয়া কানা আরশুহ আল্লাল মা'আ'।]

ইমাম আবু বকর বাকিল্লানি রহ. (মৃত্যু : ৪০৩ হিজরি) লেখেন :

ويجب أن يعلم: أن كل ما يدل على الحدوث أو على سمة النقص ف الرب تعالى يتقدس عنه. فمن ذلك: أنه تعالى متقدس عن الاختصاص بالجهات، والاتصاف بصفات المحدثات، وكذلك لا يوصف به التحول، والانتقال، ولا القيام، والقعود؛ لقوله تعالى: "ليس كمثله شيء" وقوله: "ولم يكن له كفواً أحد" ولأن هذه الصفات تدل على الحدوث، والله تعالى يتقدس عن ذلك فإن قيل أليس قد قال "الرحمن على العرش استوى". قلا: بلى. قد قال ذلك، ونحن نطلق ذلك وأمثاله على ما جاء في الكتاب والسنة، لكن ننفي عنه أماراة الحدوث، ونقول: استواؤه لا يشبه استواء الخلق، ولا نقول إن العرش له قرار، ولا مكان، لأن الله تعالى كان ولا مكان، فلما خلق المكان لم يتغير عما كان.

وقال أبو عثمان المغربي يوماً لخادمه محمد المحبوب: لو قال لك قائل: أين معبودك؟ ماذا كنت تقول له؟ فقال: أقول حيث لم يزل و لا يزول. قال: فإن قال: فأين كان في الأزل؟ ماذا تقول؟ فقال: أقول حيث هو الآن. يعني: إنه كما كان ولا مكان.

وقال أبو عثمان: كنت أعتقد شيئاً من حديث الجهة، فلما قدمت بغداد وزال ذلك عن قلبي فكتبت إلى أصحابنا: إني قد أسلمت جديداً.

"وقد سئل الشبلي عن قوله تعالى: "الرحمن على العرش استوى" فقال: الرحمن لم يزل ولا يزول، والعرش محدث، والعرش بالرحمن استوى.

দিন যায় দ্বীন বেচে

وقال جعفر بن محمد الصادق عليه السلام: من زعم أن الله تعالى في شيء أو من شيء، أو على شيء، فقد أشرك؛ لأنه لو كان على شيء لكان محمولاً، ولو كان في شيء لكان محصوراً، ولو كان من شيء لكان محدثاً، والله يتعالى عن جميع ذلك... إن قلت متى: فقد سبق الوقت كونه وإن قلت: أين فقد تقدم المكان وجوده... ومعرفته توحيدة أن تميزه من خلقه ما تصور في الأوهام فهو بخلاف ذلك كيف يحل به ما منه بدؤه، أو يتصف بما هو إنشاؤه، لا تمقله العيون، ولا تقابله الظنون، قربه كرامته، وبعده إهانتة، علوه من غير ترق ومجيئه من غير تنقل، هو الأول، والآخر والظاهر، والباطن. والقريب والبعيد، الذي "ليس كمثله شيء وهو السميع البصير".

জেনে রাখা আবশ্যক যে, যা কিছু অনিত্য (নশ্বর) হওয়া বা ক্রটির নিদর্শনের অর্থ ধারণ করে, তা থেকে আল্লাহ পবিত্র। যেমন, আল্লাহ তাআলা দিকবিশিষ্ট হওয়া এবং সৃষ্টির গুণে গুণান্বিত হওয়া থেকে পবিত্র। অনুরূপভাবে তাকে নড়াচড়া, স্থানান্তর, দাঁড়ানো বা সমাসীন হওয়ার গুণে গুণান্বিত করা হবে না। কারণ, আল্লাহ বলেছেন : ‘কোনো কিছুই তাঁর অনুরূপ নয়’। ‘তুমি বলো, তিনিই আল্লাহ, একক-অদ্বিতীয়’। তাছাড়া এই গুণগুলো অনিত্য হওয়ার অর্থ ধারণ করে আর আল্লাহ এ থেকে পবিত্র।

যদি জিজ্ঞেস করা হয়, আল্লাহ কি বলেননি যে, ‘রহমান আরশে ইসতিওয়া করেছেন’? আমরা বলব, অবশ্যই তিনি তা বলেছেন। আমরা কুরআন ও সুন্নাহয় বর্ণিত এজাতীয় আয়াত-হাদিস সাধারণভাবে প্রয়োগ করি; তবে তাঁর থেকে নিত্য হওয়ার নিদর্শন নাকচ করে বলি, তাঁর ইসতিওয়া সৃষ্টির ইসতিওয়ার সঙ্গে সাদৃশ্য রাখে না। আমরা বলি না যে, আরশ তাঁর অবস্থানস্থল বা থাকার জায়গা। কারণ, আল্লাহ তাআলা তখনো ছিলেন, যখন কোনো জায়গা ছিল না। যখন তিনি স্থান

দিন যায় দ্বীন বেচে

সৃষ্টি করলেন, তখন তিনি যে অবস্থায় ছিলেন, তা থেকে পরিবর্তিত হননি।

আবু উসমান মাগরিবি রহ. একদিন তাঁর খাদেম মুহাম্মাদ মাহবুবকে বললেন, কোনো প্রশ্নকারী যদি তোমাকে প্রশ্ন করে, ‘তোমার উপাস্য কোথায়’? তুমি তাকে কী বলবে? সে বলল, আমি বলব, যেখানে ছিলেন এবং যেখানে থাকবেন, (তিনি সেখানেই আছেন)। তিনি বললেন, যদি সে জিজ্ঞেস করে, অনাদিকালে তিনি কোথায় ছিলেন? তাহলে তুমি কী বলবে? সে বলল, আমি বলব, যেখানে তিনি এখন আছেন, (সেখানেই ছিলেন)। অর্থাৎ, যখন কোনো স্থান ছিল না তখন তিনি যেমন ছিলেন, এখনো তেমন আছেন।

আবু উসমান রহ. বলেন, আমি এসব দিকের কিছুটা বিশ্বাস করতাম। এরপর আমি যখন বাগদাদে আসলাম এবং আমার অন্তর থেকে তা দূর হয়ে গেল তখন আমি আমার সঙ্গীদের নিকট লিখে পাঠালাম, ‘আমি নতুন করে ইসলাম গ্রহণ করেছি’।

শিবলি রহ.-কে আল্লাহ তাআলার বাণী—‘রহমান আরশের ওপর ইসতিওয়া করেছেন’ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন, রহমান ছিলেন এবং থাকবেন; অথচ আরশ অনিত্য (নশ্বর)। আরশ রহমানের দ্বারা ইসতিওয়া করেছে।

জাফর সাদিক রহ. বলেন, যে ব্যক্তি দাবি করবে যে, আল্লাহ তাআলা কোনো কিছুর মধ্যে অথবা কোনো কিছু হতে কিংবা কোনো কিছুর ওপরে রয়েছেন, সে তো শিরক করল। কারণ, তিনি যদি কোনো কিছুর ওপরে থাকেন, তাহলে তিনি বহনকৃত হয়ে যাবেন। তিনি যদি কোনো কিছুর মধ্যে থাকেন, তাহলে তিনি সীমাবদ্ধ হয়ে যাবেন। আর তিনি যদি কোনো কিছুর অন্তর্ভুক্ত হয়ে থাকেন, তাহলে তিনি অনিত্য হয়ে যাবেন। অথচ আল্লাহ এ সবকিছু থেকে উর্ধ্বে।

দিন যায় দ্বীন বেচে

যদি বলো, তিনি কখন? তবে কথা হলো, সময় সৃষ্টির পূর্ব থেকে তিনি আছেন। যদি বলো, তিনি কোথায়? তবে কথা হলো, তাঁর অস্তিত্ব সময়ের ওপর অগ্রগামী।

আল্লাহ মারিফাত হচ্ছে তাঁর তাওহিদ—অর্থাৎ, তাঁকে তাঁর সৃষ্টি থেকে পৃথক করা। কল্পনায় যা কিছু চিত্রিত হয়, তিনি তাঁর ব্যতিক্রম। তিনি কীভাবে এমন জিনিসে অবতারিত হবেন, যার সূচনা তাঁর থেকে হয়েছে! তিনি কীভাবে এমন গুণে গুণান্বিত হবেন, যা তাঁর দ্বারা সৃষ্টি হয়েছে। দৃষ্টি তাঁকে দেখতে পারে না। ধারণা তাঁকে তুলনা করতে পারে না। তাঁর নৈকট্য তাঁর প্রদত্ত মর্যাদা, তাঁর দূরত্ব তাঁর প্রদত্ত লাঞ্ছনা। তাঁর উলু (উচ্চতা) উপরে ওঠা ব্যতিরেকে। তাঁর আসা জায়গা বদল করা ব্যতিরেকে। তিনিই আদি, তিনিই অন্ত, তিনিই প্রকাশ্য, তিনিই গুপ্ত। তিনিই নিকটবর্তী, দূরবর্তী; যার অনুরূপ কোনো কিছুই নেই। তিনিই সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা। [আল-ইনসাফ ফি-মা ইয়াজিবু ইতিকাদুহু ওয়া লা ইয়াজুয়ুল জাহলু বিহি : ৪১-৪২]

এছাড়াও এই গ্রন্থে আল্লাহর দর্শন-সংক্রান্ত আলোচনা প্রসঙ্গে (পৃ. ১৭৬) তিনি আল্লাহ তাআলার জন্য সুস্পষ্ট ভাষায় দিক, দেহ ও সীমাবিশিষ্ট হওয়া নাকচ করেন।

শায়খ আবু বকর যাকারিয়া-১১

ইমাম আবুল ফজল আবদুল ওয়াহিদ বিন আবদুল আজিজ হারিস তামিমি রহ. (মৃত্যু : ৪১০ হিজরি) তার সময়ে হাম্বলিদের শীর্ষ ইমাম ছিলেন। দিক ও সীমা-পরিধি নাকচের ব্যাপারে তার বক্তব্য সুবিদিত। আল্লাহ তাকে হাশাওয়ীদের প্রভাব থেকে মুক্ত রেখেছিলেন। সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয় হলো, তিনি ছিলেন আশআরি ইমাম আবু বকর বাকিল্লানি রহ.-এর ঘনিষ্ঠ বন্ধু। ইমাম যাহাবি রহ. বাকিল্লানি রহ.-এর

দিন যায় দ্বীন বেচে

মৃত্যুর বিবরণ উল্লেখ প্রসঙ্গে লেখেন :

وقد أمر أبو الفضل التميمي مناديا يقول بين يدي جنازته: هذا ناصر السنة والدين، والذاب عن الشريعة، هذا الذي صنف سبعين ألف ورقة، ثم كان يزور قبره في كل جمعة.

আবুল ফজল তামিমি একজন ঘোষককে আদেশ করলেন, সে ইমাম বাকিল্লানির জানাযার সামনে দাঁড়িয়ে ঘোষণা করবে, 'তিনি সুন্নাহ ও দীনের সাহায্যকারী। শরিয়াহর সংরক্ষক। তিনি তো এমন ব্যক্তি, যিনি ৭০ হাজার পৃষ্ঠা রচনা করে গেছেন।' এরপর তিনি প্রতি শুক্রবারে তার কবর যিয়ারত করতেন। [সিয়ারু আলামিন নুবালা : ১৭/১৯৩]

ইমাম আবু মানসুর বাগদাদি রহ. (মৃত্যু : ৪২৯ হিজরি) আহলুস সুন্নাহর সর্বসম্মত আকিদা উল্লেখ প্রসঙ্গে লেখেন :

وَقَالُوا بِنْفَى النَّهْيَةِ وَالْحَدِّ عَنْ صَانِعِ الْعَالَمِ خِلَافَ قَوْلِ هِشَامِ بْنِ الْحَكَمِ الرَّافِضِيِّ فِي دَعْوَاهُ أَنْ مَعْبُودَهُ سَبْعَةُ أَشْبَارٍ بِشَبْرِ نَفْسِهِ وَخِلَافَ قَوْلِ مَنْ زَعَمَ مِنَ الْكِرَامِيَةِ أَنَّهُ ذُو نَهْيَةٍ مِنَ الْجَهَةِ الَّتِي تَلَاقَى مِنْهَا الْعَرْشُ وَلَا نَهْيَةٍ لَهُ مِنْ خَمْسِ جِهَاتٍ سِوَاهَا وَاجْمَعُوا عَلَى أَحَالَةٍ وَصْفِهِ بِالصُّورَةِ وَالْأَعْضَاءِ خِلَافَ قَوْلِ مَنْ زَعَمَ مِنْ غِلَاةِ الرِّوَافِضِ... وَاجْمَعُوا عَلَى أَنَّهُ لَا يَحْوِيهِ مَكَانٌ وَلَا يَجْرِي عَلَيْهِ زَمَانٌ خِلَافَ قَوْلِ مَنْ زَعَمَ مِنَ الشَّهَامِيَةِ وَالْكَرَامِيَةِ أَنَّهُ مِمَّاسٍ لِعَرْشِهِ وَقَدْ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى خَلَقَ الْعَرْشَ أَظْهَارًا لِقُدْرَتِهِ لَا مَكَانًا لِدَاثِهِ وَقَالَ أَيْضًا قَدْ كَانَ وَلَا مَكَانَ وَهُوَ الْآنَ عَلَى مَا كَانَ... وَعَلَى نَفْيِ الْحَزْكَ وَالسَّكُونِ عَنْهُ خِلَافَ قَوْلِ الْهَشَامِيَةِ مِنَ الرَّافِضَةِ فِي قَوْلِهَا بِجَوَازِ الْحَزْكَ عَلَيْهِ.

তারা জগতের স্রষ্টা থেকে পরিসীমা ও পরিধি নাকচ করার মত ব্যক্ত করেছেন। হিশাম বিন হাকাম রাফেজির কথা ভিন্ন। সে দাবি করে, তার উপাস্য নিজের বিষতের সাত বিষত। সেসব কাররামিয়ার কথাও ভিন্ন,

দিন যায় দ্বীন বেচে

যারা দাবি করে, আল্লাহ যে দিক থেকে আরশের সম্মুখস্থ হন, সে দিক থেকে তিনি পরিসীমাবিশিষ্ট। এছাড়া অন্য পাঁচ দিক থেকে তিনি পরিসীমাবিশিষ্ট নন। তারা এ ব্যাপারেও ইজমা করেছেন যে, আকৃতি ও অঙ্গকে আল্লাহ তাআলার গুণ হিসেবে সাব্যস্ত করা যাবে না।

হ্যাঁ, যেসব উগ্র রাফেজিরা এমনটি দাবি করেছে, তাদের বিষয় ভিন্ন। তারা আরও ইজমা করেছেন যে, কোনো স্থান তাঁকে পরিব্যাপ্ত করে না। তাঁর ওপর কোনো কাল প্রযোজ্য হয় না। হ্যাঁ, সেসব শাহহামিয়া ও কাররামিয়ার কথা ভিন্ন, যারা দাবি করে যে, তিনি তাঁর আরশ স্পর্শ করে আছেন। অথচ আমিরুল মুমিনিন আলি রা. বলেন, নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআলা আরশ সৃষ্টি করেছেন তাঁর কুদরত প্রকাশের জন্য; তাঁর সত্তার অবস্থানের জায়গা হিসেবে নয়। তিনি আরও বলেছেন, তিনি তখনো ছিলেন, যখন কোনো জায়গা ছিল না। তিনি এখনো সেখানেই আছেন, যেখানে তখন ছিলেন। তারা আরও ইজমা করেছেন যে, আল্লাহ তাআলা থেকে নড়াচড়া ও স্থবিরতা উভয়টি নাকচকৃত। রাফেজি হিশামিয়াদের কথা ভিন্ন, যারা বলে, তাঁর জন্য নড়াচড়া সম্ভব। [আল-ফারকু বাইনাল ফিরাক : ৩৩৩]

এ থেকে বোঝা গেল, আল্লাহ তাআলা থেকে সীমা, পরিসীমা ও পরিধি নাকচ করার ব্যাপারে আহলুস সুন্নাহর প্রথম সারির ইমামগণ একমত। তবে দেহবাদীরা এই যুগের মতো সেই যুগেও আল্লাহর জন্য এসব দৈহিক বৈশিষ্ট্য সাব্যস্ত করত। ইমাম আবুল হাসান আশআরি রহ.-এর কালজয়ী রচনা ‘মাকালাতুল ইসলামিয়্যিন’ গ্রন্থে এবং ইমাম আবু মানসুর বাগদাদি রহ.-এর ‘আল-ফারকু বাইনাল ফিরাক’ গ্রন্থে দেহবাদীদের আলোচনা প্রসঙ্গে তাদের দুটো উপদলের বিবরণ উঠে এসেছে, যারা আল্লাহর জন্য সীমা, পরিসীমা ও পরিধি সাব্যস্ত করত। ইমাম আশআরি রহ. লেখেন :

فالفرقة الأولى: الهشامية أصحاب هشام بن حكم الرافضي، يزعمون

দিন যায় দ্বীন বেচে

أَن مَعْبُودَهُمْ جِسْمٌ، وَلَهُ نَهَايَةٌ وَحَدٌ.

প্রথম দল হলো হিশামিয়াহ—যারা হিশাম বিন হাকাম রাফেজির অনুসারী। তারা দাবি করে, তাদের উপাস্য দেহবিশিষ্ট এবং তাঁর পরিসীমা ও পরিধি রয়েছে। [মাকালাতুল ইসলামিয়্যিন : ৩১]

ইমাম আবু মানসুর বাগদাদি রহ. লেখেন :

أَنَّ ابْنَ كِرَامٍ دَعَا أَتْبَاعَهُ إِلَى تَجَسُّيمِ مَعْبُودِهِ، وَزَعَمَ أَنَّ لَهُ حُدًّا وَنَهَايَةً مِنْ تَحْتِهِ وَالْجِهَةِ الَّتِي مِنْهَا يَلَاقِي عَرْشَهُ... وَقَدْ ذَكَرَ ابْنُ كِرَامٍ فِي كِتَابِهِ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى مِمَّا سَ لَعَرْشِهِ، وَأَنَّ الْعَرْشَ مَكَانٌ لَهُ، وَأَبْدَلُ أَصْحَابِهِ لَفْظَ الْمَمَاسَةِ بَلْفِظِ الْمَلَاقَةِ مِنْهُ لِلْعَرْشِ... وَزَعَمَ ابْنُ كِرَامٍ وَأَتْبَاعُهُ أَنَّ مَعْبُودَهُمْ مَحَلُّ الْحَوَادِثِ... وَأَعْجَبَ مِنْ هَذَا كُلُّهُ أَنَّ ابْنَ كِرَامٍ "كَرَامٌ وَصَفَ مَعْبُودَهُ بِالْثِقَلِ، وَذَلِكَ أَنَّهُ قَالَ فِي كِتَابٍ "عَذَابُ الْقَبْرِ فِي تَفْسِيرِ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ: إِذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتْ، إِنَّهَا انفَطَرَتْ مِنْ ثِقَلِ الرَّحْمَنِ عَلَيْهَا.

ইবনু কাররাম নিজ অনুসারীদেরকে তার উপাস্যের দেহ সাব্যস্ত করার দিকে আহ্বান করেছে। সে দাবি করেছে, তাঁর উপাস্যের নিচের দিক থেকে এবং যে দিক থেকে তিনি আরশের সমুখস্থ হন, সে দিকে সীমা-পরিসীমা রয়েছে। ইবনু কাররাম তার বইয়ে লিখেছে, আল্লাহ তাআলা তাঁর আরশ স্পর্শ করে আছেন। আরশ তাঁর স্থান। তার ছাত্ররা 'স্পর্শ' শব্দকে 'তাঁর আরশের সমুখস্থ হওয়া' শব্দ দ্বারা পরিবর্তন করে দিয়েছে। ইবনু কাররাম ও তার অনুসারীরা দাবি করেছে, তাদের উপাস্য অনিত্য বিষয় সংঘটিত হওয়ার ক্ষেত্র। এ সবকিছুর চাইতেও আশ্চর্যের ব্যাপার হলো, ইবনু কাররাম তাঁর উপাস্যকে ভারী হওয়ার গুণে গুণান্বিত করেছে। সে তার 'আযাবুল কবর' বইয়ে আল্লাহ তাআলার বাণী—'যখন আকাশ বিদীর্ণ হবে'—এর তাফসির লিখেছে, আকাশের ওপরে রহমানের ভারের কারণে তা বিদীর্ণ হয়ে যাবে। [আল-ফারকু বাইনাল ফিরাক :

দিন যায় দ্বীন বেচে

২১৫-২১৮]

পাঠক, এবার একবার স্মরণ করার চেষ্টা করুন, কারা আল্লাহর জন্য একটি অসৃষ্ট (?) দিক সাব্যস্ত করে? আরশ বা তাঁর উপরকে আল্লাহর অবস্থানস্থল বলে? আল্লাহর জন্য সীমা-পরিধি সাব্যস্ত করে? আল্লাহ তাআলার সত্তায় বিভিন্ন অনিত্য বিষয় সংঘটিত হওয়া—যেমন, আরশ সৃষ্টির পরে তার উপরে আরোহণ করা—এর মত ব্যক্ত করে? এমনকি আল্লাহ তাআলার ব্যাপারে ভারের কথাও মেনে নেয়, যার কারণে এক মুনকার হাদিসে আলোকে বলে বসে, তিনি বসার কারণে আরশ বা কুরসি তাঁর ভারে গোড়ানির মতো করে শব্দ করে?

আপনি এই নব্য আসারিদের সবচে বেশি সাদৃশ্য ও সামঞ্জস্য পাবেন হাশাওয়ি ও কাররামিয়া গোষ্ঠীর সঙ্গে; আহলুস সুন্নাহর সঙ্গে নয়। ইমাম শাহরাসতানি রহ. (৫৪৮ হিজরি)-এর বক্তব্যের আলোকে একটু মিলিয়ে নিতে পারেন। তিনি লেখেন :

القاعدة الرابعة في إبطال التشبيه: وفيها الرد على أصحاب الصور، وأصحاب الجهة، والكرامية في قولهم إن الرب تعالى محل الحوادث، فمذهب أهل الحق أن الله سبحانه لا يشبه شيئاً من المخلوقات، ولا يشبهه شيء منها بوجه من وجوه المشابهة والمماثلة، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فليس الباري سبحانه بجوهر، ولا جسم، و لا عرض، ولا في مكان، ولا في زمان، ولا قابل للأعراض، ولا محل للحوادث.

চতুর্থ মূলনীতি হলো, সাদৃশ্য নাকচ করা। এই আলোচনায় তাদের খণ্ডন রয়েছে, যারা আকারের কথা বলে এবং যারা দিকের কথা বলে আর কাররামিয়াদেরও খণ্ডন রয়েছে, যারা বলে যে, আল্লাহ তাআলা অনিত্য বিষয় সংঘটিত হওয়ার ক্ষেত্র। হকপন্থীদের মাযহাব হলো, পবিত্র আল্লাহ কোনো সৃষ্টির সঙ্গে সাদৃশ্য রাখে না। সৃষ্টিও তাঁর সঙ্গে কোনো

দিন যায় দ্বীন বেচে

ধরনের সাদৃশ্য ও উপমা রাখে না। তাঁর অনুরূপ কোনো কিছুই নেই। তিনিই সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা। সুতরাং পবিত্র স্রষ্টা কোনো উপাদানগঠিত নন। কোনো দেহ নন। দেহের সঙ্গে সংযুক্ত কোনো কিছু নন। তিনি কোনো স্থানে নন। কোনো কালে নন। দেহের সঙ্গে সংযুক্ত কোনো কিছু গ্রহণকারীও নন। অনিত্য বিষয় সংঘটিত হওয়ার ক্ষেত্রও নন।

الكرامية: أصحاب أبي عبد الله محمد بن كرام... نص على أن معبوده على العرش استقرارا، وعلى أنه بجهة فرق ذاتا... وصار المتأخرون منهم إلى أنه تعالى بجهة فوق، وأنه محاذ للعرش... فمن المجسمة من أثبت النهاية له من ست جهات، ومنهم من أثبت النهاية له من جهت تحت... ومن مذهبهم جميعا: جواز قيام الحوادث بذات الله تعالى

কাররামিয়া গোষ্ঠী হলো আবু আবদিল্লাহ মুহাম্মাদ ইবনু কাররামের অনুসারী। সে স্পষ্টভাবে বলেছে, তার উপাস্য আরশের ওপরে অবস্থান গ্রহণ করে আছেন। তিনি সত্তাগতভাবে উপর দিকে রয়েছেন। তাদের পরবর্তী প্রজন্মের মত হলো, আল্লাহ তাআলা উপর দিকে রয়েছেন। তিনি আরশের সমান্তরাল রয়েছেন। দেহবাদীদের একদল তাঁর জন্য ছয় দিক থেকেই পরিসীমা সাব্যস্ত করে। আরেক দল শুধু নিচের দিক থেকে পরিসীমা সাব্যস্ত করে। আর তাদের সকলের মাযহাব হলো, আল্লাহ তাআলার সত্তার সঙ্গে অনিত্য বিষয় সম্পৃক্ত হওয়া সম্ভব।

ইমাম আবু মানসুর বাগদাদি রহ. আরও লেখেন :

المسألة الخامسة من الأصل الثالث في نفى الحد والنهاية عن الصانع

وهذه المسألة مع فرق. منها الهشامية من غلاة الروافض الذين زعموا ان معبودهم سبعة اشبار بشبر نفسه ومنهم من قال ان الجبل اعظم منه كما حكى عن هشام بن الحكم. والخلاف الثاني مع

দিন যায় দ্বীন বেচে

الكزامية الذين زعموا ان له حدا واحدا من جهة السفلى ومنها يلاقى العرش. والخلاف الثالث مع من زعم من مشبهة الرفض انه على مقدار مساحة العرش لا يفضل من احدهما عن الآخر شيء. فقلنا لهم لو كان الإله مقدرا بحد ونهاية لم يخل من ان يكون مقداره مثل اقل المقادير فيكون كالجاء الذي لا يتجزأ او يختص ببعض المقادير فيتعارض فيه المقادير فلا يكون بعضها اولى من بعض الا بمخصص. خصه ببعضها واذا بطل هذان الوجهان صح انه بلا حد ولا نهاية وقول من اثبت له حدا من جهة السفلى وحدها كقول الثنوية بتناهى النور من الجهة التى يلاقى الظلام منها وكفى بهذا خزيا

মূলনীতি হলো, স্রষ্টা থেকে পরিধি ও পরিসীমা নাকচ করা হবে। এ মাসআলাটি কয়েকটি দলের সঙ্গে দেখা দেয়। এক দল হলো, উগ্র রাফেজিদের হিশামিয়াহ, যারা দাবি করে, তাদের উপাস্য তাঁর নিজের বিষতের সাত বিষত। তাদের কেউ কেউ বলে, পাহাড় আল্লাহর চাইতে বড়, যেমনটা হিশাম বিন হাকাম থেকে বর্ণিত রয়েছে। দ্বিতীয় ইখতিলাফ হলো কাররামিয়াদের সঙ্গে, যারা দাবি করে, নিচের দিক থেকে এবং যে দিক থেকে আল্লাহ আরশের সমুখস্থ হন, সে দিকে তাঁর একটি সীমা রয়েছে। তৃতীয় ইখতিলাফ হলো সাদৃশ্যবাদী রাফেজিদের সঙ্গে, যারা দাবি করে, আল্লাহ আরশের আয়তন পরিমাণ। আল্লাহ ও আরশ কারও অংশ অপর থেকে অতিরিক্ত হয় না।... [উসুলুদ দীন : ৭৩]

ইমামুল হারামাইন রহ.-এর পিতা ইমাম আবু মুহাম্মাদ আবদুল্লাহ জুওয়াইনি রহ. (মৃত্যু : ৪৩৮ হিজরি) লেখেন :

والنهاية منفية عنه، وليس بجوهر، ولا جسم، ولا عرض، وانتفت عنه الكيفية، والكمية، والأينية، واللمية... وربما تتلو آية أو يقرع سمعك خبر فيستولي على خاطرك عدوك، كمثلى آيات الصفات، والاستواء على العرش، واليد، والنفس، والعين، وحديث النزول وما أشبه ذلك

দিন যায় দ্বীন বেচে

فمَتَى أَشْكَلُ عَلَيْكَ لَفْظٌ شَرْعِي فِي صِفَاتِ الذَّاتِ فَاصْرِفْ ذَلِكَ اللَّفْظَ إِلَى صِفَاتِ الْفِعْلِ، مِثَالُهُ قَوْلُهُ تَعَالَى: وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ، وَتَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، مَا يَكُونُ مِنْ نَجْوَى ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَاسِعُهُمْ يَحْتَمِلُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ مِنْ حَيْثُ الْعِلْمِ، لَا مِنْ حَيْثُ الذَّاتِ، وَمَنْ أَثَبَّتَ لَهُ مَكَانًا مَخْصُوصًا، أَوْ جَعَلَ الْعَرْشَ لَهُ قَرَارًا، قِيلَ لَهُ: كَيْفَ يَكُونُ الْعَرْشُ لَهُ قَرَارًا مِنْ حَيْثُ الْمَكَانِ، وَهُوَ عَلَى الْعَرْشِ يَعْلَمُ مَا عَلَى الْأَرْضِ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، وَأَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ؟ فَإِنْ اسْتَعْمَلَ أَنْ يَحْمِلَ قَوْلُهُ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ عَلَى صِفَاتِ الْفِعْلِ، فَكَذَلِكَ يُلْزِمُهُ أَنْ يَحْمِلَ الْاسْتِثْنَاءَ وَالنَّزُولَ عَلَى صِفَاتِ الْفِعْلِ، وَإِنْ اخْتَارَ الْإِعْرَاضَ عَنْ تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى وَهُوَ مَعَكُمْ، فَلْيَعْرِضْ عَنْ تَأْوِيلِ الْاسْتِثْنَاءِ عَلَى الْعَرْشِ، وَحَدِيثِ النَّزُولِ وَنِظَائِرِهِمَا، فَإِنْ مِنَ السَّلَفِ الصَّالِحِينَ مِنْ اخْتَارَ فِي هَذِهِ الظُّوَاهِرِ تَرْكَ الْكَلَامِ عَلَيْهَا مَعَ الْإِيمَانِ بِهَا، وَذَلِكَ طَرِيقَةٌ حَسَنَةٌ.

পরিসীমা তাঁর থেকে নাকচকৃত। তিনি কোনো উপাদানগঠিত নন। দেহবিশিষ্ট নন। দেহের সঙ্গে সংযুক্ত কিছুও নন। তাঁর থেকে কেমনত্ব (ধরন), পরিমাণ, কোথায় (স্থান) এবং কারণ নাকচ হয়েছে। অনেক সময় তুমি কোনো আয়াত তেলাওয়াত করো অথবা তোমার কর্ণকুহরে কোনো হাদিস ধ্বনিত হয়। এর ফলে তোমার দূশমন (শয়তান) তোমার অন্তরের ওপর প্রভাব বিস্তার করে নেয়। যেমন : সিফাতের আয়াতসমূহ, আরশের ওপর ইসতিওয়া করা, ইয়াদ (হাত), নাফস (অন্তর), আইন (চোখ), নুযুল (নেমে আসা)-এর হাদিস ইত্যাদি।

তো যখন আল্লাহ তাআলার সভাগত গুণের ব্যাপারে শরয়ি কোনো শব্দ তোমার কাছে অস্পষ্ট ঠেকবে, তুমি সেই শব্দকে কর্মগত গুণের দিকে ফিরিয়ে দেবে। যেমন, আল্লাহ বলেন : ‘তোমরা যেখানেই থাকো না কেন, তিনি তোমাদের সঙ্গে আছেন’; ‘আমি গলদেশের শিরা অপেক্ষাও বান্দার অধিক নিকটবর্তী’; ‘কখনো তিনজনের মধ্যে এমন কোনো

দিন যায় দ্বীন বেচে

গোপন কথা হয় না, যাতে চতুর্থজন হিসেবে আল্লাহ উপস্থিত থাকেন না’—এসব আয়াত সম্ভাবনা রাখে যে, এর দ্বারা জ্ঞানগত বিবেচনায় সঙ্গে থাকা উদ্দেশ্য; সম্ভাগত বিবেচনায় নয়। আল্লাহই সর্বাধিক ভালো জানেন।

যে ব্যক্তি আল্লাহর জন্য বিশেষ কোনো জায়গা সাব্যস্ত করে অথবা আরশকে তাঁর অবস্থানস্থল হিসেবে নির্ধারণ করে, তাকে বলা হবে, আরশ কীভাবে স্থান হিসেবে তাঁর অবস্থানস্থল হবে? অথচ তিনি আরশের ওপরে থেকেও পৃথিবীতে তোমরা যেখানেই থাকো না কেন, সব জানেন এবং তিনি গলদেশের শিরা অপেক্ষাও তোমাদের অধিক নিকটবর্তী থাকেন? তাঁর বাণী—‘তোমরা যেখানেই থাকো না কেন, তিনি তোমাদের সঙ্গে থাকেন’-কে সে যদি কর্মগত গুণের ওপর প্রয়োগ করে থাকে, তাহলে একইভাবে ইসতিওয়া (উপরে ওঠা) এবং নুযুল (নেমে আসা)-কেও কর্মগত গুণের ওপর প্রয়োগ করা অপরিহার্য হবে। যদি কেউ আল্লাহর বাণী—‘তোমরা যেখানেই থাকো না কেন, তিনি তোমাদের সঙ্গে থাকেন’-কে তাওয়িল করা থেকে বিরত থাকে, তাহলে সে আরশের ওপর ইসতিওয়ার আয়াত এবং নুযুল (নেমে আসা)-এর হাদিস ইত্যাদিকেও তাওয়িল করা থেকে বিরত থাকুক। কারণ, অনেক সালাফে সালেহিন এসব বাহ্যিক শব্দের ক্ষেত্রে এই মাযহাব গ্রহণ করেছেন যে, তারা এগুলোর প্রতি ইমান রাখা সত্ত্বেও এগুলোর ব্যাপারে কোনো কথা বলতেন না। এটা উত্তম পন্থা। [আত-তাবসির : ১৮৩]

এরচে অধিক সুস্পষ্ট কথা ও যৌক্তিক নির্দেশনা আর কী হতে পারে! যে সত্যকে চিনতে চায়, তার জন্য এতটুকুই যথেষ্ট। বস্তুত যারা আল্লাহপ্রদত্ত বিবেককে যথাযথভাবে কাজে লাগায় না, তারাই প্রবৃত্তির অনুগামী হয়ে একেক ক্ষেত্রে একেক নীতি অনুসরণ করে থাকে। তারা ‘সর্বত্র বিরাজমান’ হওয়ার সংশয় সৃষ্টি করে এমন সব শব্দকে তাওয়িল করলেও ‘আরশে অবস্থিত হওয়া’র সংশয় সৃষ্টি করে এমন শব্দগুলোকে

দিন যায় দ্বীন বেচে

তাওয়িল করতে রাজি নয়। অথচ সব জায়গায় থাকা যেমন তাঁর শান না, কোনো এক জায়গায় অবস্থান গ্রহণ করাও তাঁর শান নয়। সবচে মজার বিষয় হলো, ইমাম ইবনু হাজম রহ.-কে সবাই জাহেরি হিসেবে চিনে থাকলেও আল্লাহ তাআলার সিফাতের ক্ষেত্রে তার আকিদা ছিল অনেক স্বচ্ছ। এসকল অক্ষরবাদীর চাইতে অনেক শুদ্ধ ও বাস্তবসম্মত। তিনি তাঁর জগদ্বিখ্যাত ‘আল-ফিসাল ফিল মিলাল ওয়াল আহওয়া ওয়না নিহাল’ গ্রন্থে (১/৩৮৩) লেখেন :

فَأَمَّا الْقَوْلُ الثَّالِثُ فِي الْمَكَانِ فَهُوَ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَا فِي مَكَانٍ وَلَا فِي زَمَانٍ أَصْلًا وَهُوَ قَوْلُ الْجُمْهُورِ مِنْ أَهْلِ السُّنَّةِ وَبِهِ نَقُولُ وَهُوَ الَّذِي لَا يَجُوزُ غَيْرُهُ لِبُطْلَانِ كُلِّ مَا عَدَاهُ وَلِقَوْلِهِ تَعَالَى {أَلَا إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُّحِيطٌ} فَهَذَا يُوجِبُ ضَرُورَةَ أَنَّهُ تَعَالَى لَا فِي مَكَانٍ إِذْ لَوْ كَانَ فِي الْمَكَانِ لَكَانَ الْمَكَانُ مُحِيطًا بِهِ مِنْ جِهَةٍ مَا أَوْ مِنْ جِهَاتٍ وَهَذَا مُنْتَضِفٌ عَنِ الْبَارِي تَعَالَى بِنَصِّ الْآيَةِ الْمَذْكُورَةِ وَالْمَكَانِ شَيْءٌ بَلَا شَكَّ فَلَا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ شَيْءٌ فِي مَكَانٍ وَيَكُونَ هُوَ مُحِيطًا بِمَكَانِهِ هَذَا مُحَالٌ فِي الْعَقْلِ يَعْلَمُ امْتِنَاعَهُ ضَرُورَةَ وَبِاللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ وَأَيْضًا فَإِنَّهُ فِي مَكَانٍ إِلَّا مَا كَانَ جِسْمًا أَوْ عَرْضًا فِي جِسْمٍ هَذَا الَّذِي لَا يَجُوزُ سِوَاهُ وَلَا يَتَنَكَّلُ فِي الْعَقْلِ وَالْوَهْمِ غَيْرِهِ الْبَيِّنَةُ وَإِذَا انْتَقَى أَنْ يَكُونَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ جِسْمًا أَوْ عَرْضًا فَقَدْ انْتَقَى أَنْ يَكُونَ فِي مَكَانٍ أَصْلًا وَبِاللَّهِ تَعَالَى نَتَأَيَّدُ

স্থানের ব্যাপারে তৃতীয় কথা হলো, আল্লাহ তাআলা মূলত কোনো স্থানেও নন, কোনো সময়েও নন। সংখ্যাগরিষ্ঠ আহলুস সুন্নাহর অভিমত এটাই। আমরাও এ কথাই বলি। আর এটা ছাড়া ভিন্ন কিছু জায়গায়ও নয়। কারণ, এছাড়া সবই বাতিল। তাছাড়া আল্লাহ তো বলছেন যে, ‘জেনে রেখো, তিনি সব কিছুকে পরিবেষ্টন করে রেখেছেন’। এই আয়াত তো আবশ্যিকভাবে অপরিহার্য করে যে, তিনি কোনো স্থানে নন। কারণ, তিনি যদি কোনো স্থানে থাকতেন, তাহলে সেই স্থান তাঁকেও এক দিক

দিন যায় দ্বীন বেচে

থেকে বা একাধিক দিক থেকে পরিবেষ্টন করে রাখত। উল্লিখিত আয়াতের সুস্পষ্ট বক্তব্য দ্বারা এটা আল্লাহ তাআলা থেকে নাকচকৃত। তাছাড়া স্থান নিঃসন্দেহে একটি জিনিস। সুতরাং এটা তো কোনোভাবে বৈধ নয় যে, কোনো জিনিস একটি স্থানে থাকবে অথচ সে আবার সেই স্থানকে পরিবেষ্টন করে রাখবে। এটা অসম্ভব, যুক্তির দাবিতে যা অসম্ভব হওয়া স্পষ্টভাবে বিদিত। আল্লাহ তাআলার তাওফিক কামনা করি। তাছাড়া কোনো স্থানে থাকতে পারে একমাত্র দেহবিশিষ্ট সত্তা বা দেহের সঙ্গে সংযুক্ত কিছু। এর ব্যতিক্রম কোনো কিছু সম্ভব নয়। যুক্তি বা কল্পনায় এছাড়া অন্য কিছু কোনো অবস্থায়ই ভাবা যায় না। যেহেতু আল্লাহ তাআলা দেহ বা দেহের সঙ্গে সংযুক্ত কিছু নন, তাই আল্লাহ তাআলা মূলত কোনো স্থানেও অবস্থিত নন। আমরা আল্লাহর কাছে সাহায্য কামনা করি।

এভাবে আহলুস সুন্নাহর সংখ্যারিষ্ঠ ইমামই আল্লাহ তাআলা জন্য স্থান ও সীমা-পরিধি অস্বীকার করেছেন। আমরা কয়েকজনের বিবরণ উল্লেখ করেছি। এছাড়াও ইমাম ইবনু বাত্তাল (৪৪৯ হিজরি), ইমাম বায়হাকি (৪৫৮ হিজরি), ইমাম ইসফারায়িনি (৪৭১ হিজরি), ইমাম আবুল ওয়ালিদ বাজি (৪৭৪ হিজরি), ইমাম আবু ইসহাক শিরাজি (৪৭৬ হিজরি), ইমাম মুতাওয়াল্লি নিশাপুরি (৪৭৮ হিজরি), ইমামুল হারামাইন জুওয়াইনি (৪৭৮ হিজরি), ইমাম আবু হামিদ গাজালি (৫০৫ হিজরি), ইমাম আহমদ গাজালি (৫২০ হিজরি), ইমাম ইবনু আকিল হাম্বলি (৫১৩ হিজরি), ইমাম আবু বকর তুরতুশি (৫২০ হিজরি), ইমাম ইবনু রুশদ জাদ (৫২০ হিজরি), ইমাম মাযারি (৫৩৬ হিজরি), ইমাম ইবনু আতিয়া (৫৪১ হিজরি), ইমাম আবু বকর ইবনুল আরাবি (৫৪৩ হিজরি), কাজি ইয়াজ (৫৪৪ হিজরি), ইমাম শাহরাসতানি (৫৪৮ হিজরি), ইমাম ইবনু আসাকির (৫৭১), ইমাম ইবনুল জাওযি (৫৯৭ হিজরি), ইমাম মুহাম্মাদ ইবনু হিবাতিল্লাহ হামাওয়ি (৫৯৯ হিজরি), ইমাম ফখরুদ্দীন রাজি (৬০৬ হিজরি), ইমাম আবু মানসুর শাফিয়

দিন যায় দ্বীন বেচে

(৬২০ হিজরি), ইমাম ইবনু রাশিক মালিকি (৬৩২ হিজরি), ইমাম আবুল আব্বাস কুরতুবি (৬৫৬ হিজরি), ইমাম ইজ্জুদ্দীন ইবনু আবদিস সালাম (৬৬০ হিজরি), ইমাম বায়জাওয়ি (৬৮৫ হিজরি), ইমাম আজদুদ্দীন ঈজি (৭৫৬ হিজরি), ইমাম কুরতুবি (৬৭১ হিজরি), ইমাম জিয়াউদ্দীন আবুল আব্বাস আহমদ কুরতুবি (৬৬২ হিজরি), ইমাম নাওয়াওয়ি (৬৭৬ হিজরি), ইমাম কারাফি (৬৮৪ হিজরি), ইমাম ইবনুল মুনাইয়ির (৬৯৫ হিজরি), ইমাম সফিউদ্দীন আরমাওয়ি (৭১৫ হিজরি), ইমাম বদরুদ্দীন ইবনু জামাআহ (৭৩৩ হিজরি), ইমাম আহমদ ইবনু ইয়াহইয়া হালাবি (৭৩৩ হিজরি), ইমাম ইবনুল হাজ মালিকি (৭৩৭ হিজরি), ইমাম খাজিন (৭৪১ হিজরি), ইমাম শামসুদ্দীন ইস্পাহানি (৭৪৯ হিজরি), ইমাম আবু হাইয়ান উন্দুলুসি (৭৪৫ হিজরি), ইমাম তাকিউদ্দীন সুবকি (৭৫৬ হিজরি), ইমাম সলাহুদ্দীন আলায়ি কাইকালদি (৭৬১ হিজরি), ইমাম তাজুদ্দীন সুবকি (৭৭১ হিজরি), ইমাম শাতিবি (৭৯০ হিজরি), ইমাম যারকাশি (৭৯৪ হিজরি), ইমাম ইবনু রজব হাম্বলি (৭৯৫ হিজরি), ইমাম সিরাজুদ্দীন বুলকিনি (৮০৫ হিজরি), ইমাম আবু যুরআ ইরাকি (৮২৬ হিজরি), ইমাম উক্বি মালিকি (৮২৭ হিজরি), ইমাম ইবনু হাজার আসকালানি (৮৫২ হিজরি), ইমাম জালালুদ্দীন মাহাল্লি (৮৬৪ হিজরি), ইমাম সান্নুসি (৮৯৫ হিজরি), ইমাম জালালুদ্দীন সুয়ুতি (৯১১ হিজরি), ইমাম কাসতাল্লানি (৯২৩ হিজরি), ইমাম আবু ইয়াহইয়া যাকারিয়া আনসারি (৯২৬ হিজরি), ইমাম ইবনু হাজার হাইতামি (৯৭৪ হিজরি), ইমাম খতিব শিরবিনি (৯৭৭ হিজরি), ইমাম আবুস সাউদ (৯৮২ হিজরি), ইমাম মুনাওয়ি (১০৩১ হিজরি), ইমাম মাক্কারি মালিকি (১০৪১ হিজরি), ইমাম আবুল ইমদাদ বুরহানুদ্দীন লাককানি মালিকি (১০৪১ হিজরি), ইমাম মাইয়ারা মালিকি (১০৭২ হিজরি), ইমাম আবদুস সালাম ইবনু ইবরাহিম লাককানি (১০৭৮ হিজরি), ইমাম দারদির (১২০১ হিজরি), ইমাম সাওয়ি (১২৪১ হিজরি), ইমাম বাজুরি (১২৭৯ হিজরি), মুহাম্মাদ ইলিশ

দিন যায় দ্বীন বেচে

(১২৯৯ হিজরি), শায়খ খলিল আহমদ সাহারানপুরি (১৩৪৬ হিজরি), শায়খ আনওয়ার শাহ কাশ্মীরি (১৩৫২ হিজরি), শায়খ যাকারিয়া কান্ধলবি (১৪০২ হিজরি), শায়খ হাসনাইন মুহাম্মাদ মাখলুফ (১৪১০ হিজরি), মুতাওয়াল্লি শা'রাওয়ি (১৪১৯ হিজরি) প্রমুখ সবিশেষ উল্লেখযোগ্য।

★★ সমাপ্ত ★★